সোনার হরিণ

সোনার হরিণ

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

মডার্ণ পাবলিশিং সিণ্ডিকেট
১৩-১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

প্রকাশক : শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী, বি-এস্-সি
মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট
১৩-১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

দাম ১।০

PRINTER, SURES C. DAS, M.A.
ABINAS PRESS
40, MIRZAPUR STREET. CALCUTTA.

কৈশোর-যৌবনের

এক সরল-মধুর বন্ধুপ্রীতি

স্মরণে

দার্জিলিংয়ে ১
বেনামী ৬৮
অলকা ৯৯
সুধা ১১৭
সুরেশের মায়া ১৪৩

দার্জ্জিলিংএ

দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে মেল গাড়ী আসিবার সময় হইয়া গিয়াছে। আসিতে কত দেরী হইবে ভাবিয়া চঞ্চল হইয়া সকলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নানা রংএর বেশ পরিহিত কয়েকটি মেম তাহাদের বন্ধুদের অভ্যর্থনা করিবার জন্ম আসিয়াছে। তাহারা অনেকক্ষণ প্লাটফর্মে ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বেঞ্চে বসিতে আসিয়া দেখিল, প্রত্যেকটিতেই দুই-একজন করিয়া বাঙ্গালী বসিয়া আছে। বসিতে ইচ্ছা থাকিলেও কেহ বসিল না। কেবল একটি বেঞ্চে এক সাহেবী পোষাক-পরা বাঙ্গালী যুবকের পাশে দুইটি মেম বসিয়া পড়িল।

যুবকটিকে একবার দেখিলেই চোখে লাগিয়া থাকে। হঠাৎ দার্জ্জিলিঙের ঘন কুয়াসায় দেখিলে সাহেব বলিয়া ভ্রম হয়। দীর্ঘকায় না হইলেও শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট। খাঁড়ার মত উঁচু নাক প্রথমেই চোখে পড়ে। উন্নত নাসিকার দুই ধারে সুতীব্র উজ্জ্বল দুটি ছোট চোঁখ হইতে বুদ্ধির জ্যোতিঃ ক্ষরিয়া পড়িতেছে। মুখখানি ছোট হইলেও কপাল ও চোয়াল প্রশস্ত। দাড়ি-গোঁফ-কামানো মুখের প্রতি চাহিলেই মনে হয়, যুবকটি যেমন কাজের লোক তেমনি ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান্। গায়ে খয়ের-রংএর গরম সুট, মাথায় ফেল্ট হ্যাট; নীল রংএর সার্টের উপর লাল 'টাই'। যুবকটি অত্যন্ত অধীর হইয়া পেটেণ্ট চামড়ার জুতার উপর লাঠি দিয়া মৃদু আঘাত করিতেছিল। বাড়ীতে যেন কত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে,

ট্রেণটা আসিলে সে বাঁচে। কলিকাতা হইতে তাহার এক বন্ধু আসিবে, তাহাকেই অভ্যর্থনা করিতে সে আসিয়াছে; ভাবিয়াছিল, একজন চাকর পাঠাইয়া দিবে; কিন্তু প্রভাত তাহার ছেলেবেলার বন্ধু, দুই তিনখানি চিঠি লিখিয়া তাহাকে আনাইতেছে; বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে প্রভাত তাহাকে হয়ত এমন ঠাট্টা করিবে যে সে সহিতে পারিবে না।

অস্থির চিত্তে রণেন চারিদিকের লোকজনের প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিল। প্রতি মেমের সাজ অন্য মেমদের হইতে তফাৎ। এক বাঙ্গালী যুবক লপেটা পায়ে দিয়া আদ্দির পাঞ্জাবী পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অবশ্য ভিতরে গরম গেঞ্জি আছে। এক বৃদ্ধ স্বাস্থ্যকামী, গলাবন্ধ র‍্যাপার মোটা মোজা ওভারকোট শাল ইত্যাদি জড়াইয়া ভালুক সাজিয়া ঘুরিতেছেন। এক কোণে সাহেবদের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলি দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিতেছিল, তাহাদের হাসি ভরা মুখগুলির দিকে চাহিয়া রণেন বসিয়া রহিল।

ছেলেদের সরল আনন্দময় হাসি ছাপাইয়া ছোট বেলের ঝক্‌ঝক্ শব্দ কাণে আসিয়া বাজিল, সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কুলীরমণীদের থ্যাবড়া মুখ যেন আশায় ভরিয়া উঠিল, ছোট ছোট চোখ জল-জল করিতে লাগিল। রণেন হ্যাটটা ঠিক করিয়া লইয়া, প্যাণ্টের পকেট হইতে সিল্কের রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া লাঠি দিয়া ষ্টেসনের মেজে দুইবার ঠুকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ট্রেণ আসিয়া প্লাটফর্মে ঢুকিল।

ট্রেণ থামিল। এক সুদর্শন যুবক স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া গাড়ী

হইতে বাহির হইয়া রণেনের হাত জড়াইয়া ধরিল। যুবকটি রণেনের চেয়ে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বড়, মাথার মাঝখানে টেরী কাটা, দুই পাশে কালো কোঁকড়ানো চুল ঝুলিয়া পড়িয়াছে; পরিপুষ্ট মুখখানি অতি স্নিগ্ধ। নাক রণেনের মত সরু ও উঁচু না হইলেও বেশ সুন্দর। দীর্ঘপল্লবঘন দুই চক্ষে রহস্যময় দৃষ্টি, গায়ে সাদা ফ্লানেলের পাঞ্জাবী, দেশী ধুতির ওপর গেরুয়া রংএর লাল শাল জড়ানো, মোজাহীন পায়ে কালো পম্প-সু।

রণেনের চাকর গাড়ী হইতে হাতব্যাগ ছড়ি ছাতা বর্ষাতি—সব বাহির করিয়া লগেজের রসিদের জন্য দাঁড়াইয়া রহিল।

রণেন বলিল, তা হলে সত্যি এলে দেখছি। তিনখানা চিঠি লিখতে তবে আসা হোল। ওভার-কোটটা গায়েও দাও নি!

পথে শীত ত কিছুই করেনি। ঘুমের কাছে আসতে একটু হী-হী করেছিল। তখন শালটা জড়ালুম।

না, শীত কৈ! তবে ৫৭ ডিগ্রি টেম্পারেচার। দাও, তোমার লগেজের রিসিটটা।

হাঁ, এই নাও রিসিট। ও, কার্সিয়াংএ খুব ব্রেকফাষ্ট খাওয়া গেছে। তা তোমার চাকর ঠিক নিয়ে যেতে পারবে ত?

আচ্ছা, আসছ ত একজন, ক'দিনের জন্য; দশটাকা কি বলে লগেজ চার্জ্জ হয়?

ভাই, একগাদা বই আছে, আর সেই বড় ক্যামেরাটা; তুমি বলবে, লাইব্রেরী ঘাড়ে করে আনছি; কলকাতায় যা গরম, কিছু লেখাপড়া করবার জো নেই, তাই বইগুলো নিয়ে এলুম।

ও, এই জন্যে বুঝি আসা হোল।

না ভাই, তুমি এত করে লিখলে, আর আসবো না! তোমায় কত দিন দেখিনি বল তো। তবে জান তো, আমার সে থিসিস্‌টা এ বছরের মধ্যেই শেষ করতে হবে।

রণেন লগেজের রিসিট চাকর বাহাদুরের হাতে দিয়া বন্ধুকে লইয়া ষ্টেসন হইতে বাহির হইল।

প্রভাত বলিল, তোমাদের বাড়ী তো অনেক দূর, ঠিক মনে পড়ছে না, কত বছর আগে এসেছিলুম।

হাঁ, কিছু দূর বটে। এ রাস্তাটা একটু উঁচু। দেখছ, কেমন পরিষ্কার ছিল, তুমি এলে, আর চারিদিক ফগে ভরে আসছে, ঠিক বিষ্টি হবে। কাঁদাবে আর কি!

ভালই ত হে, ফগই ত ভাল। তা তুমি এবার এম-এ দিচ্ছো? গেল বছরই ত লেকচার কম্‌প্লিট্‌ হয়ে গেছল, এবার দিলেই পার। একা ত আছ, পড়া-শুনা কিছু হচ্ছে?

তোমার কি বল না, ফাষ্টক্লাস এম-এসসি হয়ে বসে আছ, সবাইকে এ্যাডভাইস্‌ গ্রাটিস্‌ দিচ্ছ। ইংরাজীতে এম-এ পড়া কি বাবুগিরি জান না ত।

প্রভাত একটু অপ্রতিভ হইয়া, কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য বলিল, তোমাদের বাড়ীতে একটা বড় হট-হাউস্‌ ছিল না, আছে?

হাঁ আছে। তবে সেটাকে যে যত রকমের গাছ পাথর পাতা শেকড় মাটি এনে ভরিয়ে তোমার মিউজিয়াম করবে, তা' হবে না।

কিন্তু ভাই, ওই জন্তে আমায় একটা ঘর ছেড়ে দিতে হবে। তোমাদের বাড়ী ত মস্ত; আর যখন বলছ, আর কেউ নেই।

একদিকে একজনেরা ভাড়া আছে, সুন্দর ফ্যামিলি। কথাটা বলিতে রণেনের মুখ চাপা হাসিতে আনন্দে ভরিয়া গেল।

আর একদিকে তুমি একা!

তবে সে দিকটায় সব সময়ে বড় থাকি না, বলিয়া রণেন আবার মৃদু হাসিল, রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া লইল। প্রভাত অত লক্ষ্যই করিল না। রণেন চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, মৃদু হাসিয়া বলিল, আমাদের বাড়ীতে যাঁরা আছেন, বুঝলে খুব ইণ্টারেস্‌টিং পরিবার।

কোন মেয়ে আছেন বুঝি, গায়িকা—সুন্দরী—কি বল?

না—তুমি যে সেই—তোমায় চোখে দেখার আগে তোমার স্বপন চোখে লাগে—এখন বেদনা না জাগলেই বাঁচি। এক মিষ্টি গলার মিষ্টি সুর রণেনের কাণে বাজিতে লাগিল।

কিন্তু ভাই, আমার থিসিসের খানিকটা লিখতেই হবে, অন্ততঃ আউট্‌লাইনটা। এখন গিয়েই সবাইয়ের সঙ্গে ভাব করতে পারছি না।

বইগুলো মিছেই বয়ে নিয়ে এলে। আমায় লিখে জানালে, আমি সদুপদেশ দিতুম। ও বাক্স-বন্দীই থাকবে, বলে রাখছি।

না, তা' হলে মোটেই চলবে না। এ কাজটা না সেরে ফেললে, সাগর-পাড়ি দেবার কোন চেষ্টা করতে পারছি না।

কিন্তু, তুমি ওই মাটি আর পাথরের মধ্যে কি রস পাও

জানি না। আমায় ত হাজার টাকা দিলেও ওই পাথরগুলোর নাম মুখস্থ কর্‌তে পারতুম না।

সে যা' হোক, আপাততঃ আমি তোমার তরুণী বন্ধুদের সঙ্গে ভাব করতে পারছি না। তুমি একাই জমিয়ে রেখেছ, বুঝছি। আমায় এখন গোড়ায় কিছুদিন ছুটি দাও। কল্‌কাতায় গরমে ত লিখতে পড়তে পারতুম না, চুপচাপ শুয়ে ভেবেছি। সেই আইডিয়াগুলো, যত শীগ্‌গীর পারি, লিখে ফেলতে হবে।

আচ্ছা দেখা যাবে কত আইডিয়ার ঠিক থাকে—

আর কতদূরে হে—এ ত ওয়েষ্ট পয়েণ্টের কাছাকাছি এলুম।

আর মিনিট তিন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুই বন্ধু বাড়ীর গেটে আসিয়া পৌছিল। অক্‌ল্যাণ্ড রোডের ওপর বেশ বড় একখানি বাড়ী, টিন কাঠ আর কাচের তৈরী। বাড়ীতে ঢুকিবার আঁকাবাঁকা পথের দুইধারে পাইন গাছের সারি, নিস্তব্ধ প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া একটু বাতাস বহিতেই সন্‌সন্‌ শব্দে ধ্বনি করিয়া উঠিল। পাইন-গাছের তলায়-তলায় ফুলের ঝাড়। বাড়ীর ঠিক সম্মুখে কসমস মার্‌গারেট ডেসি আইভি নানা বিচিত্র বর্ণের ফুল, রঙের হোলি-খেলা হইতেছে। প্রভাত অবাক্‌ হইয়া সেখানে দাঁড়াইতেই একটা গান কাণে আসিয়া বাজিল,

"সে কোন্ বনের হরিণ
ছিল আমার মনে
কে তারে বাঁধল অকারণে—"

বাড়ীখানি দুইটি পরিবারের থাকিবার মত দুইভাগে ভাগ করা, চারিদিক ঘিরিয়া কাচে-ঘেরা বারান্দা। ঢুকিবার দুইটি পাশাপাশি দরজা। দক্ষিণের অংশটায় এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া আছেন। বামের দিকটায় রণেন আছে। প্রবেশের দুই দরজার মাঝখানে একটা বড় গোলাপ ফুলের গাছ, আগুনের শিখার মত রাঙা-ফুলে-ভরা গাছের ঝাড় দরজা দুইটির উপর নিকুঞ্জ রচনা করিয়া টিনের চালে উঠিয়া গিয়াছে। গাছের তলা স্নোপ্ল্যাণ্ট দিয়া ঘিরিয়া সাজানো। দুই দরজার দুইদিকে দুইটি ডালিয়ার গাছ।

রণেন ধীরে ডানদিকের দরজার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া থামিল। প্রভাত নিবিষ্ট মনে গান শুনিতে শুনিতে রণেনকে ছাড়াইয়া একেবারে দরজার গোড়ায় আসিয়া পড়িল; দেখিল, সম্মুখের বারান্দার এক কোণে বসিয়া একটি মেয়ে গান গাহিতেছে। প্রভাত অতি লজ্জিত হইয়া পাশের দরজার দিকে দৌড় দিল। রণেন যে এ কাণ্ডটা ইচ্ছা করিয়া ঘটাইয়াছে, তাহা বুঝিয়া সে ভারি রাগিয়া উঠিল। হঠাৎ গান থামিয়া গেল। এক সরল মিষ্টি হাসির শব্দ তাহার কাণে আসিল।

হাসি তাহাকেই লইয়া। রণেন নির্দ্দোষ ভালমানুষের মত তাহার পেছনে বাড়ীতে ঢুকিতেই, সে কি ধমক দিবে ভাবিতেছিল, আবার সেই হাসি ও কথা কাণে আসাতে সব ভুলাইয়া গেল।

রণেন মৃদু হাসিয়া, তাহার দিকে চাহিয়া, ভিতরের ঘরে ঢুকিয়া গেল। পাশের বাড়ী হইতে কতকগুলি কথা বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া প্রভাতের কাণে মধুর সুরে বাজিতে লাগিল।

ছি, শুকু, অমন করে হাসতে হয়?

বা, হাসবো না বুঝি! তবে কাঁদি,—কাঁদবো? কাঁদি মা?

চুপ কর একটু, শুকু একটু ঘুমোগে যা না—পাড়া একটু জুড়োক, আর বাজনা নিয়ে প্যান-প্যান করিস নে।

বাজনা তোমার ভালো লাগে না বুঝি। বা! বাজনা ভালোবাসতেই হবে, আমি বাজাব—বাজাব!—যতক্ষণ না বলবে বাজনা ভালবাসি, ততক্ষণ বাজাব, ছাড়ব না।

আচ্ছা বাপু, বাজনা আমার খুবই ভাল লাগে। এখন একটু বন্ধ কর, আমাদের প্রাণটা যে যাচ্ছে।

এই বন্ধ করলুম—হা—হা। আচ্ছা, কলেজের মেয়েগুলো কি ছোটলোক, বাবা! রোজ চিঠির জন্যে প্রতীক্ষা করছি, আর একদিন একজনও চিঠি দিলে না! আসবার সময় কত ঢং—এ বলে চিঠি দেবো, ও বলে চিঠি লিখো। আমি কিন্তু স্পষ্ট বলে এলুম, আমি ভাই কাউকে চিঠি দিতে পারবো না,—ও সব ভাই আমার আসে না। তবে তোমরা যদি চিঠি কেউ না দাও, ভারি রাগ করব। আচ্ছা, রণেনবাবু বন্ধুটিকে নিয়ে কেমন আমাদের বাড়ী তুলছিলেন দেখছিলে।—আচ্ছা মা, বড় টেবিলটা পরিষ্কার করবো, তা'তে বকবে না ত—বেশ. দিদি এত নোংরা করতে পারে—

'এত্তা বড় টেবিল যে এত্তা জঞ্জাল
হরদম লাগাতে ঝাড়ন তবভি এসা হাল।'

কিছুক্ষণ পরে যখন দুই বন্ধুতে চায়ের টেবিলে বসিল, রণেন আড়চোখে প্রভাতের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। প্রভাত ঠিক করিয়াছিল, পাশের বাড়ীর পরিবারের কোন কথা কহিবে না, বা তুলিতে দিবে না। কোন্ ঘরটায় শুইবে, কোন্ ঘরটায় পড়িবে, কোন্‌টায় লাইব্রেরী করিবে, মনে-মনে তাহারই মতলব আঁটিতেছিল। দ্বিতীয়বার চা ঢালিতে, আবার কোন হাসির ধ্বনিতে সে অভিভূত হইয়া পড়িল। চায়ে চিনি না দিয়াই খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

রণেন বলিল, ওহে, অত তাড়াতাড়ি কেন, ও কেকটা খাও; দেখ, মেয়েটি বেশ, এত সরল।

আচ্ছা, তোমায় আমি কিছু জিজ্ঞেস করেছি?

মুখেই না হয় কর্‌ছ না—কিন্তু মনে-মনে? সত্যি বল। আর, ওঁর বাবা এত ভদ্রলোক—পরিবারের সবাই ভারি আমুদে।

তুমি সারাদিন ওই বাড়ীতেই থাকো, বুঝতে পার্‌ছি।

তা, তুমি কি বলতে চাও, ওঁরা কত হাসি-গল্প করবেন, আর আমি এখানে নির্জ্জন কারাবাসে থাক্‌ব? তুমি হয় ত তাই থাকতে চাও।

আমায় ভাই থাক্‌তেই হবে।

আচ্ছা, তোমার বইয়ের বাক্সটা কলকাতায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তুমি তা বলে, কি বলে আমায় ওঁদের বাড়ী ঢোকাচ্ছিলে?

নিজেই গানে মুগ্ধ হয়ে ঢুকছিলে—আবার আমায় দোষ। কাউকে ঠিক দেখতে পেলে? শুধু একটা লাল জ্যাকেট!

কি যা-তা বলিস্, চুপ্। কিছুক্ষণ থামিয়া, শূন্য চায়ের কাপে

চামচ নাড়িতে নাড়িতে প্রভাত আবার বলিল, কলেজে পড়েন বোধ হয় ?

হাঁ, চুপ্—থার্ড-ইয়ারে পড়েন—কৈ আর কিছু প্রশ্ন করছো না—চুপ্।

ক'জন আছেন ওঁরা ?

ক'জন ? মিষ্টার রায, তাঁর স্ত্রী, দুই মেযে, এক ছেলে ; আর মিষ্টার রায়ের এক শালা। জলটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আর এক কাপ যদি ঢালতে চাও, ঢেলে নাও।

ছোটটিই বুঝি গান গাইছিলেন ?

বা ! ঠিক ধরেছ। বড মেযের বিযে হয়ে গেছে। ও, কত চিনি ঢালছ ? দ্বিতীয় কাপে চিনি দাও নি, তাই বুঝি পুষিয়ে নিচ্ছো ? ওই তোমার সব লগেজ এসে পডেছে। তোমার তা' হলে ওদিকেব সব-শেষেব ঘবটা চাই যেন একটুও হাসি গান না পৌছতে পারে—আচ্ছা।

তোমার বোধ হয ও বাডীতে এখন একটু যেতে হবে ?

আচ্ছা গো, আচ্ছা।

রণেন উঠিয়া প্রভাতেব জন্য ঘর ঠিক কবিয়া দিতে গেল প্রভাত সেই ঠাণ্ডা চা আর অর্দ্ধভুক্ত কেকেব সম্মুখে বসিযা মিষ্টি হাসি ও গলার স্বর শুনিতে লাগিল।

চোখের চাউনির যেমন এক যাদু-শক্তি আছে, গলার স্বরেরও তেমন এক মন্ত্রশক্তি আছে। মানুষের স্বভাব, তার আত্মার পরিচয়, তার গলাব সুরে বোঝা যায়। এ যেন

তার অন্তরের সঙ্গীত। যদি সে মন বেসুরে বাঁধা থাকে, তাল কাটিয়া যাইবে, ঝঙ্কার কিছুতেই উঠিবে না।

প্রভাত এ মেয়েটিকে দেখে নাই, কেবল তাহার হাসি, তাহার গলার সুর, কথার আওয়াজ শুনিয়াই যেন তাহার সহিত নিবিড় ভাবে পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার মনের অবস্থাটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এই সব ভাবনা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য সে কিছু না খাইয়া, লগেজ খুলিবার জন্য উঠিয়া চলিয়া গেল।

প্রভাত যখন লগেজ খুলিয়া জামা কাপড় বই গুছাইতে বসিল, রণেন তখন রায়েদের বাড়ীতে। সে দরজা খুলিয়া ঢুকিতেই, মিষ্টার রায়ের ছোট মেয়ে শকুন্তলা সরল হাসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, কৈ আপনার বন্ধুটি?

সে এখন বই গোছাতে বসেছে।

বই চাপা পড়ে যেন মারা না যান—বেশ ত আমাদের বাড়ী আসছিলেন।

মিসেস্ রায় কালো 'রাগে' অর্দ্ধদেহ ঢাকিয়া, সোফায় হেলান দিয়া বসিয়া টুর্গেনিভের একখানা নভেল পড়িতেছিলেন, রাগান্বিত স্বরে বলিলেন, শুকু!

মিষ্টার রায় কালো ওভারকোট মুড়ি দিয়া, সেদিনকার

খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন, হাসিয়া বলিলেন, এস রণেন! তোমার বন্ধুটি বুঝি বিশ্রাম কর্‌ছেন?

আজ্ঞে হাঁ।

শকুন্তলা চায়ের টেবিল সাজাইতেছিল। পাশে বয় দাঁড়াইয়া। নিজেই সে-সব পেয়ালা প্লেট রাখিতেছিল। টেবিলের মাঝখানে এক বড় ক্যাক্‌টাস ঘিরিয়া, জিরেনিয়াম, আইভি, ফার্ণ জড়ান এক সুন্দর ফুলের তোড়া। তোড়াটি কিন্তু শুকনো। রোজ রণেন নিজে আপনার হাতে ফুল তুলিয়া, তোড়া বাঁধিয়া মালিকে দিয়া পাঠাইয়া দেয়। আজ তাড়াতাড়িতে ভুল হইয়া গিয়াছে। শকুন্তলা সরল চোখ দিয়া একবার ফুলের তোড়ার দিকে চাহিল, রণেন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেই বলিল, চা'টা খেয়ে যান।

আমি এই যে খেয়ে এলুম।

বা! তা' কি জানি, রোজ আমাদের সঙ্গে খান. আজও খেতে হবে।

মিষ্টার রায় বলিলেন, ও কি শুকু, উনি এই যে খেয়ে আস্‌ছেন্।

যতীনমামা পাশের ঘরে লেপ-মুড়ি দিয়া পড়িয়া ছিলেন। চায়ের গন্ধে উঠিয়া আসিয়া, দুষ্টামি-ভরা চোখে রণেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তা রণেনবাবু আর এক কাপ পার্‌বেন,—খুব পার্‌বেন।

মিসেস্ রায় বলিলেন, কেন জোর করে খাওয়ানো!

যতীনবাবু বলিলেন, জোর কে করছে, উনি নিজেই বসলেন, চা না-খেয়ে উঠছেন না।

যতীনমামার সব সময়েই ফাজ্‌লামি!—বলিয়া শকুন্তলা

তার দিদির ঘরে দিদি ও ছোট ভাই লাবুকে বেশ জ্বালাতন করিয়া তুলিতে গেল।

যতীনবাবু সহাস্য মুখে বসিয়া, নিজের কাপে চা ঢালিয়া, রণেনের সম্মুখের কাপে একটু চা ঢালিয়া যেন শিহরিয়া উঠিলেন। বড় কেট্‌লি টেবিলের মাঝখানে রাখিয়া অভিনয়ের স্বরে বলিলেন, ও থুড়ি—থুড়ি—বড় ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করবেন। অ-শুকু, চা দিয়ে যা না?

মিষ্টার রায় একটু হাসিলেন। মিসেস্ রায়ও লুকাইয়া হাসিলেন। দিদি দরজার আড়াল হইতে উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিলেন। আর শকুন্তলা মুখ রাঙা করিয়া, ধীরে তাহার বাবার কাপে চা ঢালিতে আরম্ভ করিল।

দাও মা, রণেনের কাপেও চা ঢেলে দাও! তোমার বন্ধু কি করেন, রণেন?

এম্‌-এস্‌সি পাশ করে বসে আছেন।

কি বিষয়?

জিয়লজি। তবে বোটানিও খুব ভালো জানেন।

শকুন্তলা রণেনের কাপে তাড়াতাড়ি চা ঢালিয়া, একটু চিনি ও দুধ দিয়া কোনমতে চা দিয়া, নিজে চা ঢালিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

যতীনবাবু গম্ভীর ভাবে আড়-চোখে রণেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, দেখুন ত, আপনার চিনি কম হয়েছে কি না, লাবু, চিনিটা এগিয়ে দে ত। তিনি শকুন্তলার দিকে হাসিয়া চাহিলেন। সে চাউনির মানে এই যে, শকুন্তলার হাতের চায়ে কি রণেনের চিনি কম লাগিতে পারে।

রণেন কিন্তু দুষ্টামি করিয়া বলিল, একটু কম হয়েছে।

যতীনবাবু যেন অতি দুঃখের স্বরে, অভিনয়ের সুরে বলিলেন, ও আমি যে চা-টুকু ঢেলেছিলুম, সেটুকু বুঝি আর কিছুতেই মিষ্টি হচ্ছে না। অতি আবেগের সহিত তিনি চিনির পাত্র রণেনের দিকে আগাইয়া দিলেন। শকুন্তলা মনে মনে চটিয়া, এর প্রতিশোধ কিরূপে লওয়া যাইবে তাহাই ঠিক করিতে লাগিল।

অর্দ্ধেক চা খাইয়া শকুন্তলা বড় প্লাম-কেক কাটিতে বসিল। বাবা, মা, দিদি, যতীনমামাকে দিয়া, রণেনের দিকে চাহিল।

রণেন বলিল, না, আমার আর দরকার হবে না।

যতীনমামা বলিলেন, দাও—দাও, খুব ধর্‌বে।

রণেন ও লাবুকে দুইটি ছোট অংশ দিয়া, শকুন্তলা নিজের জন্য প্রায় কিছুই না রাখিয়া, একখানি বড় খণ্ড আবার যতীন বাবুকে দিল।

আ, আমার কি সৌভাগ্য, এমন রাগ করে রোজ একখানা করে দিও।

দেখো না মা—যতনেমামা কি কর্‌ছে?

আ যতীন, শুকু একটু শান্ত হ!

আচ্ছা, আমি কতক্ষণ চুপ করে আছি, বল তো,—কতক্ষণ দুষ্টামি করিনি—দেখ লাবু, কি সুন্দর ওখানটায় ফগ্‌ কেটে যাচ্ছে—কি সুন্দর নীলপাখী!

লাবু বাহিরের দরজার দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া তাকাইয়া, নীলপাখীর কোন সন্ধান না পাইয়া, যখন প্লেটের দিকে

চাহিল, দেখিল, তাহার দু'খানি ক্রীমরোল কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

মা—ছোটদি—বলিয়া সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

আ—শুকু—

শকুন্তলা তখন এক গানের পদ গাহিতেছিল,—

গরম গরম চা, তাতে প্লামকেক,
তাতেও নাইক অরুচি—

কি মা—বা! আমি কি জানি? সে ত নীলপাখী পেছন দিয়ে নিয়ে গেল!

ছোটদিদির গান শুনিয়া, লাবুও চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না,—ক্রীমরোলের শোক ভুলিয়া সে গাহিয়া উঠিল,—

গরম গরম চা, তাতে ক্রীমরোল,
তাতেও নাইক অরুচি—
মাংসের রোষ্ট, জেলি আর টোষ্ট,
পোলাও কালিয়া খাবো জি—

মা, একদিন পোলোয়া খাব।

চুপ—লাবু, একেবারে চুপ।

বা—আমার ক্রীমরোল?

শুকু দাও, ওর কেক দাও—

বা, আমি কি জানি মা? ও কেন আমার বই লুকিয়েছে?

আমি লুকিয়েছি বুঝি?

ছি, লাবু মিথ্যে কথা বলবে না, মিথ্যে কথা বল্‌তে নেই। বল, আমি লুকিয়েছি, দেব না। লুকোইনি বোলো না।

সে বুঝি আমি লুকিয়েছি! ছোটদি, যতীনমামা ত আমায় লুকুতে বল্লে!

অতি নিরীহ ভালোমানুষের মত চাহিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া যতীনবাবু বলিলেন, আমি? তিনি যেন কিছুই জানেন না।

শকুন্তলা ইসারা করিয়া বলিল, লাবু, যতীন মামার বাঁ পকেটে। লাবু লাফাইয়া উঠিল, যতীনমামার পকেটে হাত দিতেই, সত্যই দুইটি নয়, চারিটি ক্রীমরোল বাহির হইয়া পড়িল। কিরূপে যে এতগুলি আসিল, তাহা যতীনমামা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

মিসেস্ রায় বেশ আমোদ উপভোগ করিয়া বলিলেন, হাঁ যতীন, কেক চুরি? মিষ্টার রায় বলিলেন, শালা চোর! যতীনবাবু সত্যই ধৃত-চোরের মত মুখ করিয়া, লজ্জায় অধোবদন হইয়া অভিনয়ের চূড়ান্ত করিলেন।

চা খাওয়া শেষ হইলে, রণেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাগানে গিয়া একটি তোড়া অতি সুন্দর করিয়া বাঁধিয়া, শকুন্তলাকে দিয়া বন্ধুর সন্ধানে চলিল।

বাড়ী ঢুকিয়া রণেন দেখিল, প্রভাত সত্যই একটি লাইব্রেরী সঙ্গে আনিয়াছে। তাহার বইয়ের বড় আলমারি ভরিয়া গিয়াছে। বই সাজাইয়া, ঘরের জিনিষ-পত্র সাজাইয়া, প্রভাত বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া রণেন তাহাকে ডাকিল না। তাহার দিকে চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া আপন ঘরে ঢুকিল। জুতা বদলাইয়া একটা চটিজুতা পরিল। আয়নায় চুলটা ঠিক করিয়া নিল।

তারপর দরজার সম্মুখে আসিয়া গোলাপপুষ্প পর্য্যবেক্ষণে মন দিল।

যতীনবাবু তাহাকে অমন আনমনা দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ডাকিলেন, আসুন রণেনবাবু, এক দান তাস খেলা যাক।

বস্তুতঃ রণেন এই ডাকটিরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। তবে এইমাত্র আসিয়া, আবার রায়েদের বাড়ী যাইতে একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। দ্বিতীয়বার ডাকিতে, সে পাশের দরজা দিয়া তাহাদের ঘরে ঢুকিল।

তাসখেলার পাণ্ডা ও ওস্তাদ যতীনমামা। বৃষ্টিমুখর কুয়াসাচ্ছন্ন কর্ম্মহীন দিনগুলি কাটাইবার বেশ আমোদজনক উপায় বলিয়া, মিষ্টার রায়ও ইহাতে মজিয়াছেন। মিসেস্ রায় বড় খেলেন না। তবে দিদিমণি তাস পাইলে আর কিছু চান না। শকুন্তলার খেলাটা বড় ভালো লাগে না, সে ভালো জানেও না। তবে খেলার দোষ ধরিয়া দিতে অদ্বিতীয়। খেলোয়াড় হওয়ার চেয়ে সমালোচক হওয়ায় সুযোগ-সুবিধা বেশী বলিয়া সে সেইটি পছন্দ করে।

রণেন এক চেয়ারে বসিল। যতীনমামা ডাকিলেন, শুকু, তাসটা কোথায় দিয়ে যা। পাশের ঘর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর আসিল, আমি এখন কপি কুটছি, যেতে পারবো না। ওঁদের তাস কোথায়, জামা কোথায়, জুতো কোথায়, রুমাল কোথায়, সব শুকু জানে—কেন?

তারপর রণেনের গলা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, আপনি রাতে ভাত খাবেন, না

লুচি? আমি তাসটাস কিছু জানি না বাপু। খেলবেন ওঁরা—আমি কখনও খেলেছি?

রণেন নির্নিমেষ নয়নে শকুন্তলার হাস্যরহস্যদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আজ একটু খেলবেন আসুন না?

না—দেখুন, আজ আমার এখন একটুও সময় নেই। মাছের তরকারি চড়িয়ে আসছি। কাল দুপুরে খেলব—আপনার বন্ধুকে নিয়ে আস্‌বেন।

যতীনবাবু বলিলেন, হাঁ, তুমি আবার খেলবে—ছাই!

আচ্ছা দেখ, কাল যদি না তোমাদের হারিয়ে দি—

মিসেস্ রায় বলিলেন, বোস না শুকু একটু খেল্‌তে, আমি না হয় তরকারিটা দেখছি গে—

না মা, তুমি বেশ আরামে পড়ছো, কেন সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। লাবু, আয় ত ভাই, আমায় একটু হেল্প করবি, না দিদি, তোমার মোটেই উঠতে হবে না—হা—হা—বাবা দেখছেন, বলি কালে-কালে কতই হোল, পুলিপিঠের কলেজ বেরোল!

সরল মধুর হাসির তরঙ্গ সমস্ত ঘরে ছড়াইয়া দিয়া লাবুকে টানিয়া লইয়া শকুন্তলা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। রণেনের মন খেলায় তেমন বসিল না তবু সে মুখে হাসি লইয়া খেলায় বসিয়া গেল।

রণেনের মন যখন সাহেব বিবি গোলাম টেক্কার লাল ও কালো রঙের রাজ্যে উড়িয়া গিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল, প্রভাত তখন সোফায় চুপ করিয়া শুইয়া তাহার বৈজ্ঞানিক

থিওরির কথা ভাবিতেছিল—কত কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বের পৃথিবীর আদিম যুগের কথা। তখন পৃথিবীতে কোন জীবের জন্ম হয় নাই। এই সমুদ্র-স্তনিতা গিরি-মণ্ডিতা নদী-মেখলা শস্যশ্যামলা জীবধাত্রী বসুন্ধরা এক অগ্নিপিণ্ড ছিল। কত লক্ষ লক্ষ যুগ অহর্নিশি শূন্যপথে ঘুরিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। তারপর অগ্নি, জল, বাতাস, জলে স্থলে কি সংঘাত, সংগ্রাম! ভূমির বিভাগ হইল। এই পাহাড়দের জন্মকথা, ধাতুদ্রব্যের সৃষ্টি কি রহস্যময়। ধীরে ধীরে জল ও ভূমির মিলন-তটে জীব-প্রাণের জন্ম হইল। সেই প্রাণ কত যুগ ধরিয়া কত বৃক্ষ লতা পাতা কত মৎস্য পক্ষী পশুর জন্ম দিয়া কত অদ্ভুত কত বীভৎস কত ভীষণ কত বিচিত্ররূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করিয়া মানব-রূপে প্রকাশিত হইল। তারপর এই মানব-পৃথিবীর ইতিহাসই বা কি আশ্চর্য্যকর।

প্রভাত ভাবিতেছিল, কাল হইতেই সে কাজ আরম্ভ করিয়া দিবে। রণেনের ও-বাড়ী রহিয়াছে, সে তাহাকে বেশী বিরক্ত করিবে না, সময় নষ্ট করিবে না। কিন্তু সকল চিন্তার মধ্যে একটা হাসি যেন তাহাকে আনমনা করিতেছিল, তাহার নানা রংএর পাথরের সারির মধ্যে একখানি নিমেষে-দেখা মুখ ভাসিয়া উঠিতেছিল। সেই হাস্যদীপ্ত মুখখানি উনানের আগুনের রক্তিম আভা মণ্ডিত লাল জ্যাকেটের সঙ্গে যেন এক রংএ ছোপান, উজ্জ্বল চোখ দুইটি কড়ার উপর তরকারির রং দেখিতেছে।

সহসা প্রভাতের মনে হইল; অরণ্যে প্রথম মানবের জন্ম

হইতে মানুষ কেবল দুইটি জিনিষ চাহিয়াছে, তাহার জীবনে দুইটি কাজ,—খাদ্যের সন্ধান আর প্রেমের সন্ধান; দুইটি ক্ষুধা,—অন্নের জন্য ও অন্তরের জন্য। আহার, আশ্রয় ও নারী—এই কি জীবনের চরম সার্থকতা? সে ভুলিয়া গেল, আর একটি ক্ষুধা আছে,—জ্ঞানের পিপাসা।

পরদিন প্রভাতে প্রভাত যখন জাগিল, তখন বেলা হইয়া গিয়াছে, পাশের শোবার ঘর হইতে বরেন উঠিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিতেই, একটা গানের সুর কানে আসিয়া বাজিল। তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বারান্দায় আসিয়া কাচের দরজা খুলিয়া দেখিল, পাশের বাড়ীর মেয়েটি গোলাপ-কুঞ্জে দাঁড়াইয়া গাহিতেছে—

"নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে,
তার মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না—"

চারিদিকে সব সাদা। আকাশ আলো মাটি যেন কোন্ শুভ্র যবনিকায় ঢাকা পড়িয়াছে। প্রভাতের নির্ম্মল আলো শিশির-ভেজা ঘাসে, ঝাউগাছগুলির পাতায় ঝিকিমিকি করিতেছে। স্নোপ্লাণ্টগুলিতে জলবিন্দু হীরার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। হেলিয়োট্রোপ রংএর একখানি সাড়ি পরিয়া মেয়েটি গাহিতেছিল। সদ্য-জাগা স্নিগ্ধ মুখের উপর নবোদিত সূর্য্যের আলো।

প্রভাতের মুখচোখ যেন ঝিকিমিকি করিয়া উঠিল। দরজা খোলার শব্দে শকুন্তলা গান থামাইয়া চাহিল, মাথা নত করিয়া

ধীরে পাশের দরজা দিয়া চলিয়া গেল। তাহার মুখের উপর দিয়া মৃদু-মধুর হাসি তাহার অজ্ঞাতে খেলিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারিল না। নিমেষের মধ্যে সে শুধু দেখিয়াছিল—একগাদা কালো কোঁকড়ানো চুল, নির্ম্মল স্নিগ্ধ আনন্দিত চোখের চাউনি। প্রভাতও শকুন্তলার মুখ ভাল করিয়া দেখে নাই। তাহার মনে হইল আজ যেন সে কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে, দেশের বা মানবের কল্যাণের জন্য এক নিমেষে জীবনদান করিতে পারে। এক নিমেষে সে যাহা পাইয়াছে, তাহাই তাহার যাত্রাপথের অক্ষয় আনন্দময় পাথেয়।

চা খাইয়াই সে পড়িবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। ঘরখানি বাড়ীর শেষ-সীমান্তে! পেছনে পাইন গাছ আর বাঁশবনে ভরা পাহাড় নামিয়া কার্ট রোডে গিয়া পড়িয়াছে। ঝাউপাতার সন্‌সন্‌ বেণুবনের মরমর ছোট ঝরণার ঝরঝর শব্দ-মুখরিত ঘরে গিয়া সে কয়েক মিনিট স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কাজ করিবার কি অফুরন্ত শক্তি সে পাইয়াছে, তবু কাজে লাগিতে মন সরিতেছে না। ইচ্ছা হইতেছিল, এই আলো-ছায়া-ঘন ঝাউবনের স্নিগ্ধ-শীতল অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া মেঘের খেলা দেখে!

চারিদিক নিবিড় মেঘে ঘিরিয়া আসিল। প্রভাত নিবিষ্ট মনে কয়েকখানি বই লইয়া পড়িতে ও নোট লইতে আরম্ভ করিয়া দিল। আজ তাহার মনে কত নূতন নূতন, চিন্তা ভাব আসিয়া ভিড় করিল, তাহার থিসিসের থিওরিটা এত স্পষ্ট হইয়া ধরা দিল যে সে নিজেই অবাক্ হইল।

দুপুরে খাওয়ার পর রণেন হাসিয়া বলিল, বন্ধু, চল, তাস খেলে আসা যাক্। সকালের ঘটনাটা তাহার চোখ এড়ায় নি। প্রভাত বলিল, না সখা, আমায় একখানা বই আজ শেষ করতেই হবে! অগত্যা রণেন একাই রায়েদের বাড়ী চলিল।

তাস খেলিবার কথা ছিল বটে, কিন্তু মিষ্টার রায়ের কয়েকখানা জরুরী চিঠি লিখিতে হইবে, যতীনমামার দুপুরে একটু ঘুম না হইলে নয়। সুতরাং রণেন বন্ধুকে লইয়া যাইতে না পারায় একটু অপ্রস্তুতে পড়িল। শকুন্তলা দুষ্টামির হাসি হাসিয়া পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, চলুন ত, হারমোনিয়মটা নিয়ে একটু প্যাঁ-পোঁ করা যাক। সেটা যে প্রভাতের পড়াশুনায় ব্যাঘাত করিবারই আয়োজন, তাহা রণেনও বুঝিল না। গান গাওয়া হইবে জানিয়া, সে তখন তাস খেলার দুঃখটা ভুলিতেছিল।

মিষ্টার রায় বলিলেন, কিন্তু শুকু, বেশী চেঁচিও না, আমায় চিঠিগুলো লিখতে হচ্ছে।

পিতার নিকট অনুমতি পাইয়া, রণেনকে লইয়া সে চঞ্চলপদে পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল; কিন্তু হারমোনিয়াম খুলিয়া বসিলে তাহার আর কোন গানের উৎসাহ রহিল না। রণেনের দিকে হারমোনিয়াম এগাইয়া দিয়া বলিল, আপনি একটা গান।

তা' হলে একটা সুর বাজাই।

উদাস দৃষ্টিতে সে বলিল, সে ভালো, বেশ একটা

হিন্দুস্থানী সুর। আপনার কাছ থেকে অনেকগুলো ভাল সুর শিখলুম, কখনো ভুলব না।

রণেনের গণ্ড দুইটি লাল হইয়া উঠিল। সে মীরাবাইয়ের এক গানের সুর বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। হঠাৎ বাজানোর মধ্যে শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনার বন্ধু গান জানেন?

তেমন ভালো জানে না। তবে ভালো বাঁশী বাজাতে জানে।

আমাদের একদিন শোনাবেন না?

বোলবো।

হঠাৎ পাশের ঘর হইতে যতীনমামা গাহিয়া উঠিলেন—শুকু ঘুমোল, পাড়া জুড়োল, রণেন এলো দেশে। যতীনবাবুর ঘুমের বিশেষ ব্যাঘাত হইতেছিল। তিনি জানিতেন, এ গান গাহিলে, হারমোনিয়াম একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু আজ ফল আশানুরূপ হইল না।

শকুন্তলা হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, মজা দেখাচ্ছি। ধরুন ত একটা খুব চেঁচামেঁচির গান।

কিন্তু আপনার বাবা যে চিঠি লিখছেন।

তাই ত! বাবা, আপনার চিঠি লেখা হয়েছে? আমরা চেঁচিয়ে গাইতে পারি?

মিষ্টার রায় চিঠি লেখা মোটে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি মেয়েটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, আর যতীন শালা একটু জব্দ হয়, তাহাও ইচ্ছা ছিল। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা চেঁচিয়ে গাইতে পারো।

তখন শকুন্তলা গলা ছাড়িয়া গান ধরিল, "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ"—যতীনমামাকে দিবা-নিদ্রার আশা ত্যাগ করিতে হইল। লাবু বিছানা হইতে হাসিয়া "যেদিন সুনীল—" গানের সুরে গাহিয়া উঠিল, যখন গরম বিছানা হইতে উঠিলে কাঁদিয়া যতীনমামা—

এক অস্ত্র ব্যর্থ হইল; তবু যতীনবাবু নিরাশ হইলেন না। ভালো করিয়া রাগ মুড়ি দিয়া গাহিয়া উঠিলেন,—

শুকু আছে বলে রে ভাই আমরা বেঁচে আছি;
কিন্তু আর একজনে যে হায় মরার কাছাকাছি—
(শুকুর তরে) মরার কাছাকাছি—

রণেনের চোখ-মুখ লাল হইয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল, হারমোনিয়াম বাজাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। শকুন্তলা কিন্তু হার মানিল না, সে কাঠের দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া এত উচ্চ স্বরে গাহিতে লাগিল যে যতীনমামা তাহার গলার সহিত পাল্লা দিতে না পারিয়া চুপ করিলেন।

গান চলিতে লাগিল। প্রভাত যেখানে পাথর মাটি ধাতুদের জগতে নিমগ্ন ছিল, সেখানে গানের সব কথা পৌঁছাইতে ছিল না বটে, কিন্তু একটি মধুর সুর তাহাকে আকুল করিয়া দিতেছিল। সেই সুরে সে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রাণের আনন্দে লিখিয়া যাইতেছিল। শুধু মাঝে মাঝে যেন চোখ পড়িতে চাহিতেছিল না, কলম নড়িতে চাহিতেছিল না, মন কয়েক মুহূর্তের জন্ত উদাস হইয়া উঠিতেছিল।

রণেন একটা গজল ধরিল, তাহার মন-মাতানো সুরে সবাই মুগ্ধ হইয়া উঠিল।

মিষ্টার রায় বলিলেন, শুকু, ওটা শিখে নাও।

গান শেখানো চলিতে লাগিল। গান শিখাইতে রণেন ভারি আনন্দ পাইত। কখনও সহসা এক মীড়ের টানে শকুন্তলাব সরল স্নিগ্ধ চোখ দুইটি তাহার চোখের ওপর আসিয়া পড়ে, কখনও এক পদ ভুল গাহিয়া শকুন্তলার গাল গোলাপ ফুলের মত রাঙা হইয়া ফুলিয়া ওঠে, গাহিতে-গাহিতে দুইজনের গলা এক সুরে মিশিয়া যায়, কখনও যেন কি অজানা ব্যথায় তাহার চোখ কালো হইয়া আসে, কখনও সুরের আলোয় মুখে কি দিব্য শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, কখনও এক লাইন ইচ্ছা করিয়া ভুল গাহিয়া সে মধুব হাসে।

এই গান গাওয়া, গান শোনাব মধ্য দিয়াই তাহাদের দুইজনের জানাশোনা হইয়াছে, এম্নি কথাবার্ত্তা তাহারা খুব কম বলিয়াছে। এই জানাশোনা একদিকে যেমন অস্পষ্ট, অপর দিকে তেম্নি নিবিড় গভীর। তাহারা দুইজনে যেন এক গানের নদীর দুই ধারে দাঁড়াইয়া আছে, সুরের তরী দিয়া আনাগোনা পারাপার হইতেছে। কিন্তু এ মিলন কি রহস্যময়। দক্ষিণ বাতাস যেমন ফুলের পাপড়িগুলি স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়, চাঁদের আলো যেমন ঝর্ণার জলকে ছুঁইয়া যায়, তেম্নি একজনের মন সুরের লোকে আর একজনকে স্পর্শ করে। এ মিলন-জাল অতি সূক্ষ্ম, ইহাকে ধরিতে গেলে

ছিঁড়িয়া যায়, দেখিতে গেলে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ ইহাকে মহা সত্য বলিয়া অন্তরে অন্তরে স্বীকার করিতেই হইবে।

গজল শিখিয়া শকুন্তলা বলিল, ও, তিনটে বেজে গেল, চায়ের সব ঠিক করতে হবে, আপনি ত আমাদের এখানে খাচ্ছেন না?

একটু ব্যথিত হইয়া হাসিয়া রণেন বলিল, না, দেখি বন্ধুটি আমার কি কর্‌ছেন।

এম্নি করিয়া কয়েকদিন কাটিয়া গেল। হাস্যে গল্পে গানে খেলায় রণেনের দিন অতি মধুর সুখকর ভাবে কাটিতেছিল। প্রভাতের দিনও কম আনন্দকর ছিল না। সে যেন এক অপূর্ব্ব জগতে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার মনের অবস্থাটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। প্রতিদিন সকালে উঠিয়া নিমেষের জন্য সে একবার শকুন্তলার দেখা পায়, একটি প্রভাতী গান শোনে। সেই সুর সকল কাজে, চিন্তায় তাহার মনে গুঞ্জরণ করে। এই দেখাটুকু, গান শোনাটুকু তাহার সমস্ত দিনের আনন্দের পাথেয়। কি তীব্র সুখের সহিত লেখাপড়া করে, মাথা এত পরিষ্কার, চিন্তা এত গভীর, বেগবান্ থাকে। সে থিসিসে তন্ময় হইয়া যায়। তবে মাঝেমাঝে হঠাৎ সে কেন আনমনা হইয়া ওঠে, খাতা মুড়িয়া ভাবিতে বসে—সে মেয়েটি এখন কি করিতেছে—খাবার টেবিল গোছাইতেছে, সবাইয়ের কাপড় আলনায়

সাজাইতেছে, কুট্‌নো কুটিয়া বয়কে কি হুকুম করিল; প্লেট অপরিষ্কার, ভালো মাজা হয় নাই বলিয়া চাকরকে বকিয়া নিজেই ধুইতে আরম্ভ করিয়াছে। লাবুর সহিত কোন খুনসুটি, যতীনমামার সঙ্গে কোন পরিহাস। সে কেবল সরল হাসির সুধায় এ সংসার সিঞ্চিত করিয়া সকলকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখে নাই, সদা মঙ্গল-কর্ম্ম-রত হস্তে অন্তরের সেবা দিয়া সকলের সকল অভাব দূর করিতেছে। বিছানা, কাপড় জামা, রুমাল হইতে স্নানের জল, খাবার—কে কি পরিয়া বেড়াইতে যাইবে, কে কি খাইবে, সকলের প্রতি সজাগ সপ্রেম দৃষ্টি আছে। শকুন্তলার হাসি কেবল পাহাড়ের ঝর্ণাধারার মত কলকল করিয়া বহিয়া যায় না, এ যেন গভীর নদী জলের ওপর ঢেউয়ের মাতামাতি কলধ্বনি—সে নদী কেবল গান গাহিয়া যায় না, দুই তীর নির্ম্মল করিয়া ফুল ফুটাইয়া সোনার ফসল ফলাইয়া বহিয়া যায়। প্রভাত তাহার থিসিসে মন দেয়, বারবার সে মন কোন্‌ হাসির জগতে ভাসিয়া আসিতে চায়।

সকালে সুন্দর সূর্য্যের আলো দেখিয়া প্রভাত বাহাদুরকে বলিল, আজ হট-হাউসেএ সে লেখাপড়া করিবে। তাহাকে দিয়া কয়েকখানা বই, খাতা ও একখানা চেয়ার পাঠাইয়া দিল। বাড়ীর ঠিক পেছনে রণেনের অতি আদরের গর্ব্বের হট-হাউস।

আজ সকালে এক গানের সুর তাহার কাণে বাজিতেছিল,—

"তুমি যে এসেছো মোর ভবনে, তাই রব উঠেছে ভুবনে।"

প্রভাত মৃদুস্বরে গাহিতে গাহিতে চলিল,—"নইলে ফুলে কিসের রং লেগেছে"—হট-হাউসের দরজায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—একখানি নীল সাড়ীর আঁচল দেখা যাইতেছে। ঢুকিবে কি না ভাবিতেছে, এক শিশুর মিষ্টি হাসির শব্দ কাণে আসাতে মন্ত্র-চালিতের মত ঢুকিয়া পড়িল।

সমস্ত ঘর ফুলের রঙে রঙীন, সব টব ফুলে ছাওয়া। ঘরের মাঝখানে শকুন্তলা একটি ছোট মেয়েকে লইয়া ফুল দেখাইতেছে ও আদর করিতেছে। প্রভাতকে দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল, যেন তাহারা কতদিনের পুরাতন পরিচিত। কাহারও একটু সঙ্কোচ বোধ হইল না।

স্নিগ্ধ স্বরে প্রভাত বলিল, বেবীটিকে কোথা থেকে পেলেন?

প্রভাতের নির্ম্মল উজ্জ্বল চোখের দিকে চাহিয়া শকুন্তলা বলিল, ওই পাশের বাড়ীর মেমদের আয়াটার কাছ থেকে কেড়ে আনলুম।

ষ্ট্রবেরীর মত লাল গাল টিপিয়া আদর করিয়া প্রভাত বলিল, ভারী সুন্দর ত! বাস্তবিক, বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ে না থাকলে আমার ত ভারি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে।

আমি বেবী ভারি ভালবাসি, জানেন?

প্রভাত কয়েকটি জিরেনিয়াম ছিঁড়িয়া বেবীর হাতে দিল।

ফুল ছিঁড়ছেন, রণেনবাবু কিন্তু বকবেন।

তা না হয় বন্ধুর একটু বকুনি খাবো।

আপনি ত এখানে এখন পড়াশুনা করবেন, আর বিরক্ত করবো না, আমি ভারি গোলমাল করি—আপনার ভারি অসুবিধে হয় ?

মোটেই নয়, আমার ভারি ভালো লাগে। প্রভাতের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। বেবী কাঁদিয়া ওঠায় শকুন্তলা তাহাকে ভুলাইতে লাগিল, বেবী কিছুতেই থামিতেছে না দেখিয়া বুকের সোনার সেফটি-পিন্ খুলিয়া তাহার হাতে দিল।

প্রভাত শকুন্তলার দিকে চাহিয়া দেখিল। প্রতি প্রভাতে যে গায়িকার সুর-দীপ্ত মুখ দেখিয়াছে, তাহা হইতে এ মুখ অনেক তফাৎ। মধুর হাসিতে মুখখানি মধুময়। তবু চোখ দুইটির কোণে একটু কালিমা। উজ্জ্বল দুই তারা হইতে সরলতা ও প্রতিভার জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত। এই আনন্দময় আলো যে দিকে পড়িবে, সে স্থান নির্ম্মল উজ্জ্বল করিবে; এ আলো দীপ্ত করিবে, দাহ করিবে না, দ্বিপ্রহরের খর-রবিকরের মত নয়, জ্যোৎস্নার আলোর মত স্নিগ্ধ, প্রভাতের আলোর মত পবিত্র। প্রভাতের আরও যেন মনে হইল, এ আলো সন্ধ্যার গোধূলি আলোর মত করুণ, উদাস। এ এত হাসে, এত গায়, তবু কোথায় যেন একটা গোপন ব্যথা লুকানো আছে। এ যেন জীবনে একটা গভীর আঘাত পাইয়াছে বা পাইবে।

বেবী সেফ্‌টি-পিন্‌টা সিমেণ্টের মেজেয় ফেলিয়া দিল। প্রভাত ধীরে তাহা তুলিয়া শকুন্তলার হাতে দিল। বেবী বারবার অতি ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল বলিয়া প্রভাত বলিল, চলুন,

ওই গাছটার তলায় যাওয়া যাক, অতগুলো ফুল দেখলে ও কিছু ভুলবে।

হট-হাউসের দরজায় ভুটিয়া আয়ার মুখ দেখা গেল। দিন, আমি দিয়ে আস্‌ছি, আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন, বলিয়া প্রভাত বেবীকে শকুন্তলার কোল হইতে লইয়া আয়ার কাছে দিয়া আসিল।

বসুন না চেয়ারটায়।

না, বেশ আছি, বলিয়া শকুন্তলা ফিউসিয়া ফুলের ঝাড়ের তলার এক টবে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। বিগোনিয়া ফুলের মত রাঙা মুখ ঘেরিয়া কালো কেশের রাশি; তাহার ওপর ফিউসিয়া ফুলগুলি নত হইয়া পড়িয়াছে। গায়ে পিটুনিয়া ফুলের রং-এর এক জামার ওপর এষ্টার ফুলের রং-এর একখানি শাড়ি। মোজা-বিহীন পায়ে ক্যাক্‌টাসের মত লাল ভেলভেটের চটিজুতো। সূর্য্যের আলো ভাঙা কাচের মধ্য দিয়া ঝরিয়া পড়িয়া সমস্ত দেহ দ্যুতি-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

কোন মন্ত্র-বলে দুইজনের মনের দরজা খুলিয়া গেল, অতি-পুরাতন বন্ধুর মত নিঃসঙ্কোচে তাহারা গল্প জুড়িয়া দিল, যেন তাহারা কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া কত গল্প করিয়া আসিয়াছে।

কত তুচ্ছ সরল কথা, কত সামান্য দৈনন্দিন ঘটনা,— প্রতিদিনের জীবনের গল্প কত অপরূপ কত রহস্যময় হইয়া রোমহর্ষণ নভেলের চেয়েও ভালো বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

নিজেদের জীবনের কথা আসিল। থিসিসের কথা, জীবনের উচ্চ আদর্শের কথা, ভারতে কোথায় কি ধাতু লুকানো থাকিতে পারে, সে কোন্ দেশের কোন্ ধাতুর সন্ধান করিবে—ইত্যাদি নানা কথা প্রভাত বলিয়া যাইতে লাগিল; শকুন্তলাও তার কলেজের গল্প, পড়াশুনার কথা বলিতে লাগিল। তাহারা মন খুলিয়া গল্প করিতেছিল; কিন্তু শকুন্তলা প্রায়ই গম্ভীর হইতেছিল, মাঝে মাঝে অতি মৃদু হাসিতেছিল। তাহার উচ্চহাস্যের মত তাহার গাম্ভীর্য্যও স্বাভাবিক সুন্দর।

অনেকক্ষণ গল্প করছি আপনার কত লেখা হত, আপনার সময় নষ্ট করলুম—ও, দেখুন মাংসটা চড়িয়ে এসেছি, পুড়ে না গেলে হয়। কতক্ষণ এসেছি বলুন ত?

কি জানি, খুব বেশীক্ষণ নয়। ঘড়িতে সময় হিসাব করিলে, খুব জোর তিন কোয়াটার হইত; কিন্তু প্রভাতের মনের ঘড়িতে এ সময় অপরিমেয়, এ হিসাবের বাহিরে।

আচ্ছা আজ আসি, মা রান্নাঘরে একা আছেন,—বলিয়া শকুন্তলা মাথা একটু নত করিয়া নমস্কার করিল।

প্রভাতও প্রতি-নমস্কার করিল।

শকুন্তলা চলিয়া গেল। প্রভাত অনেকক্ষণ ধরিয়া হট-হাউসে এ-ফুল ও-ফুল দেখিয়া ঘুরিল। বই-খাতা সব পড়িয়া রহিল, কোন বে-হিসাবী আনন্দ আজ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে।

হট-হাউস হইতে বাহির হইয়া দেখিল, সামনে লাবু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে ডাকিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাব করিয়া

তাহাকে ধরিয়া বেড়াইতে লইয়া গেল। বাড়ীর পেছনে পাইন, মেপেল, বাঁশ-বনের মধ্যে, নানা বাজে গল্প করিতে করিতে দুইজনে ঝাউপাতার ছাওয়া সরুপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রভাত বাঁশ কাটিয়া লাবুকে এক বাঁশের বন্দুক তৈরী করিয়া দিল। দুইজনে কড়াইসুটি ক্ষেতে নামিয়া কিছুক্ষণ কড়াইসুটি ছিঁড়িয়া খাইল। আজ প্রভাতের অন্তর যেন উপছাইয়া পড়িতেছে, কি করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। লাবুকে বিদায় করিয়া সে ফগে-ঢাকা বেণু-বনে বসিয়া গাহিতে লাগিল,—

"তুমি যে এসেছো মোর ভবনে, তাই রব উঠেছে ভুবনে।

খাবারের টেবিলে বসিয়াই প্রভাত ধরা পড়িল। তাহার মুখের চোখের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য চাঞ্চল্য দেখিয়াই রণেন বুঝিল, একটা কিছু ঘটিয়াছে।

কি সখা, কি হল ?

প্রভাত ভাবিল, সব খুলিয়া বলে ; কেমন বাধিয়া গেল। এ যেন কোন পবিত্র মন্দিরের নির্ম্মল রহস্যের কথা, জানাইলে পাপ হইবে। সে হাসিয়া বলিল, ভাই, ভারী ক্ষিদে পেয়েছে— এই বাহাদুর, ছিটো ছিটো। তারপর আনমনে গাহিয়া ফেলিল, 'তুমি যে এসেছো মোর ভবনে'। রণেন হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল, বা,—বা, এ যে প্রাণ চায়—চক্ষু না চায়—চলো, আজ খেয়ে গিয়ে মিষ্টার রায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি—তিনি তোমার কথা বলছিলেন।

না ভাই—আচ্ছা, দুপুরে নয় বিকেলে।

আলাপের সময়টি কিছু পিছাইয়া দিতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। দুপুরে আর লেখাপড়া হইল না, চুপ করিয়া কোচে অর্দ্ধশয়ান ভাবে শুইয়া, যেন দিবাস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে প্রভাত তাহার এক বন্ধুকে চিঠি লিখিল—

বন্ধু,

তুমি যদি এখানে আসতে, তবে মেঘের খেলা দেখতে দেখতে পাহাড়গুলো গুণতে-গুণতে, ঝর্ণার গান শুনতে-শুনতে, গল্পের জাল বুনতে-বুনতে, আঁকা-বাঁকা পথের পরে পাহাড়-বন ঘুরে ঘুরে, ফার্ণ কুড়াতাম, ষ্ট্রবেরী খেতাম, ফগ মেখে ম্যালে যেতাম, দেখতাম বসে কত না সং, প্রতি মেমের নতুন ঢং। হেলাফেলা সারাবেলা, হট-হাউসে ফুল তোলা, জিরোনিয়াম ফিউসিয়া পিটোনিয়া বিগোনিয়া; হল্লা হত, হত হাসি, বৃষ্টি ভিজে সর্দ্দি কাশি, বাড়ী এসে চা খেতাম, রাগ্ মুড়ি দিয়ে গান ধরতাম।

চুপটি করে আছি শুয়ে, পাইন গাছের মাথায় চেয়ে; পাশের বাড়ীর অচিন মেয়ে, মাঝে মাঝে উঠছে গেয়ে। প্রভাত-পাখীর গানের মত, ঝর্ণাধারার তানের মত—তাহার কথা, তাহার হাসি, যেন পদ্ম হতে পাপড়ি রাশি, পড়ছে ঝরে, পড়ছে ঝরে, শুনছি শুয়ে একলা ঘরে। মাঝে কাচের কাঠের আড়াল, বাইরে হাওয়া যেন মাতাল, জড়াজড়ি পাতায় পাতায়, মাতা-মাতি শাখায় শাখায়, ঘাসে-ঘাসে কানাকানি, গাছে গাছে জানাজানি; ফুলে ফুলে হাসাহাসি,—ভালবাসি-ভালবাসি।

আমার শুধু হচ্ছে মনে, আকাশ আলোয় মাটির সনে, কাহার কথার মিষ্টি সুরের রঙে গেছে সকল ভরে। চুপটি করে শুনছি শুয়ে, পাইন গাছের মাথায় চেয়ে।

বিকেলে রণেন যখন আসিয়া বলিল, চলো সখা, ও-বাড়ী যাওয়া যাক, সে যে কেন কোন মতে যাইল না, তাহা ভাবিয়া সে নিজেই অবাক্ হইল। রণেন সত্যই রাগ করিয়া বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। প্রভাত যেন এক স্বপ্নের ঘোরে বহুক্ষণ বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া রহিল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। হঠাৎ সব মেঘ কাটিয়া গিয়া সন্ধ্যার রাঙা আলোয় চারিদিক সুন্দর হইয়া উঠিল। প্রভাত কি মনে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া, রায়দের দরজার নিকট দাঁড়াইল। মিষ্টার রায় সম্মুখে বসিয়াছিলেন; তিনি অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিলেন, আসুন, প্রভাত বাবু। প্রভাত ঘরে ঢুকিয়া, মিসেস রায়কে এক নমস্কার করিয়া, সম্মুখে এক চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মিষ্টার রায় আপনিই নানা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে মাঝে মাঝে দুই একটা কথা বলিয়া কথাবার্ত্তায় যোগ দিয়া কোনমতে বাঁচিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে প্রভাত বলিয়া উঠিল, কৈ, আজ বেড়াতে গেলেন না?

মিষ্টার রায় বলিলেন, না, আজ শরীরটা ভালো নেই, আর সন্ধ্যে হয়ে এল। ঠিক সেই সময়ে শকুন্তলা ঘরে ঢুকিতে, প্রভাত উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

অন্য সময় হইলে শকুন্তলা উত্তর দিত, কাজ আছে, রান্না করতে হবে। কিন্তু সে কেমন নীরব হইয়া গেল।

তাহাকে এমন স্তব্ধ দেখিয়া মিষ্টার রায় মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, যাও না শুকু, প্রভাতবাবুর সঙ্গে একটু বেড়িয়ে এস। তুমি ত দু'দিন বেড়াতে যাও নি। পাশের ঘর হইতে যতীন-মামা ফোড়ং দিলেন, যাও, যাও শুকু, এমন রঙীন সন্ধ্যাটা মাটি হয়ে যাচ্ছে!

শকুন্তলা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল,—গোল টেবিল ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মাও তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, আধ ঘণ্টা বেড়িয়ে এস, আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।

কি যেন এক অজানা শক্তি শকুন্তলাকে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল।

দুইজনে যখন বাহিরে আসিল, কাহারও মুখে কোন কথা ফুটিল না। ব্যাপারটা কি ঘটিল, তাহা শকুন্তলা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। আর প্রভাত ভাবিতেছিল, এমনি ভাবে বেড়াইতে টানিয়া আনা কতদূর ভদ্রতার নিয়মোচিত, হয়ত সে সভ্যতার গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে। শকুন্তলা চারিদিকে বাবুকে খুঁজিতেছিল; কিন্তু কোন দিকে তাহার দেখা মিলিল না।

দুইজনে নীরবে পাইন-গাছের তলা দিয়া অক্ল্যাণ্ড রোডে উঠিল। গেটে আসিয়া প্রভাত বলিল, তাই ত, একটা ছাতা আনা হল না যে।

কি দরকার! দেখুন,—না, আপনি আর যাবেন না,

বিষ্টি হবে না। যদি হয় ত আমিই—প্রভাত বলিতে যাইতেছিল, আপনার জন্য দায়ী, তাহা আর বলা হইল না। শকুন্তলা বলিল, না। যদি হয়, একটু মজা করে ভেজা যাবে।

চলুন, কোন্ দিকে যাওয়া যায়।

ঘুমের দিকেই চলুন। দার্জ্জিলিঙের ভিড় আমি মোটে পছন্দ করি না। নীরবতা একবার ভাঙ্গিয়া যাইতেই, আবার অনর্গল কথার স্রোত চলিতে লাগিল। হট-হাউসের অসমাপ্ত কথাবার্ত্তার শেষ সূত্র ধরিয়া আবার গল্প সুরু হইল। আবার নিজেদের জীবনের কথা, ছেলেবেলার কথা, স্কুলের হাসি-কান্না, কলেজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, গত জীবনের কত ছোট ছোট হাস্যকর ঘটনা—অফুরন্ত হাসির স্রোত বহিতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে চারিদিকের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে মন্তব্য চলিতে লাগিল।

শকুন্তলা বলিল, বাঃ! কি সুন্দর ষ্ট্রবেরী! আসুন, কিছু তোলা যাক্। প্রভাত রাস্তা হইতে পাহাড়ের একটু ওপরে উঠিয়া, ভালো ভালো ষ্ট্রবেরী তুলিয়া শকুন্তলার আঁচল ভরিতে লাগিল।

বা! আমায় সব দিচ্ছেন, আপনি কিছু খাচ্ছেন না! কি সুন্দর খেতে, টক আমার ভারি ভালো লাগে!

না না, আঁচলে বাঁধবেন না; আমি রুমাল দিচ্ছি। কিছু সঙ্গে নেওয়া যাক্, লাবু খুব খুসি হবে!

আর যতীনমামাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খেতে হবে। বা! কি সুন্দর ফার্ণ!

বেশ সুন্দর। কিন্তু মেডেন হেয়ার ফার্ণ আমার ভারি ভালো লাগে।

বা, সুন্দর ফগ ঘিরে আস্‌ছে, এই রকম আমার বেশ লাগে। নানা কথা কহিতে কহিতে তাহারা কতদূর আসিয়াছিল তাহা খেয়ালই ছিল না। তাহারা যেন দুই বালক-বালিকা, স্কুল পালাইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। হঠাৎ সুতীক্ষ্ণ শীতল ঝোড়ো বাতাসে প্রভাতের শাল ও শকুন্তলার আঁচল উড়িতে লাগিল।

প্রভাত বলিল, ও, এ যে একেবারে বাতাসিয়ায় এসে পৌঁছেচি! আর এগোন সুবিধের নয়, চলুন ফেরা যাক।

লুপটা দেখে গেলে হত না?

না, দেখুন, সে আর একদিন হবে, আপনার ছুটি ত বেশীক্ষণ নয়!

তবে ফিরুন।

ফিরিয়া দেখিল, সম্মুখে কুয়াসা অতি ঘন; দুই ধারের গাছের ছায়ায় পথের ঘন অন্ধকার অতি নিবিড়।

বড় অন্ধকার হয়ে এল, বিষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে।

শকুন্তলা হাসিয়া বলিল, না, ও গাছের পাতার জল। এ রকম অন্ধকার আমার ভারি ভালো লাগে, যেন অন্ধকার ধপ্‌ধপ্‌ কর্‌ছে।

প্রভাত শঙ্কিত স্বরে বলিল, কিন্তু সত্যিই যে বিষ্টি এল। একটা গরম কাপড়ও আনেন নি, আমার শালটা নিন।

না—না—বলিয়া শকুন্তলা আপত্তি জানাইল।

যা—তা হবে না—দেখুন, ভিজে অসুখ করলে—প্রভাত আর বলিতে পারিল না। শকুন্তলা বুঝিল যে, বাস্তবিক তাহার অসুখ করিলে প্রভাতকেই দোষী হইতে হইবে। প্রভাত যখন নিজের শালটা শকুন্তলার গায়ে জড়াইয়া দিল, সে আর কোন আপত্তি করিল না।

প্রভাত ধীরে ধীরে বলিল, মাথায় তুলে নিন, মাথাটা কেন মিছেমিছি ভেজাবেন।

তা বটে, চুল শুকোতে এক হাঙ্গাম। বা, আমি কি স্বার্থপর! দিব্যি শাল মুড়ি দিয়ে যাচ্ছি, আর আপনি ভিজে যাচ্ছেন।

আপনার জুতোটা মাটি হোল, ঝরা পাতাগুলো ভিজে পচপচ করছে।

আর আপনার জুতোটা বুঝি পাথর হচ্ছে। না চলুন, ওই ঝোপটায় একটু দাঁড়ানো যাক। আপনি কত ভিজবেন।

ওখানে দাঁড়িয়ে বিশেষ কিছু সুবিধে হবে না। কাছাকাছি কোথায় বড় পাথর ছিল—

এই যে, পাথরটার আড়ালে বেশ দাঁড়ানো যাবে—আসুন।

ভেজা ত যথেষ্ট হয়েছে, দাঁড়িয়ে কি লাভ।

এই রুমালটা দিয়ে মাথাটা মুছে ফেলুন।

ট্রিফার্ণ ও মসে ছাওয়া এক বড় কালো পাথরের আড়ালে কয়েকটি বড় গাছের তলায় দুইজনে দাঁড়াইল। অতি বেগে বৃষ্টি আসিল, বাতাস মাতিয়া উঠিল, তীরের মত, তীক্ষ্ণ বারিধারা অবিশ্রাম ঝরিতে লাগিল। দুই পাশের গাছের সারি

এই বারিধারা-সিক্ত পুলকিত তরুণ-তরুণী পথিকদ্বয়কে ঘিরিয়া হা-হা করিয়া অট্টহাস্য-ধ্বনি করিতে লাগিল।

দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিল। বৃষ্টির বেগ যত বাড়িতেছিল, দুইজনের মনের আনন্দ ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। প্রভাতের অন্তরে যেন কি কলরোল পড়িয়া গিয়াছে। সে শুধু মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিতেছিল, বিষ্টির শব্দ কি সুন্দর শুনতে লাগছে। শকুন্তলাও এই কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন বৃষ্টি-মুখর পর্ব্বত-পথে দাঁড়াইয়া অপরিসীম সুখ পাইতেছিল। চেঁচাইয়া সে গাহে নাই বটে, কিন্তু তাহার মনের তারে কে যেন বাজাইতেছিল,—

"মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।"

বৃষ্টি থামিল। কিন্তু কুয়াসা এত ঘন কালো হইয়া আসিল যে, পথের কিছুই দেখা যাইতেছিল না। সাদা ফগের মধ্যে লাল শাল জড়ানো শকুন্তলার সুন্দর মুখখানি স্বচ্ছ সরোবরে পাপড়িঘেরা পদ্মের মত ফুটিয়া রহিয়াছে। সে মুখও অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল।

প্রভাত থামিয়া বলিল, তাইত, পথ কিছুই দেখা যাচ্ছে না, আর বাঁ দিক একেবারে খোলা।

সাহসিকা একটু হাসিয়া বলিল, পড়লে একেবারে গড়্‌গড়িয়ে কার্ট রোডে—কি বলেন?

না, এমনি করে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। আপনি অত ধার দিয়ে যাবেন না, এই দিকটায় আসুন। আমি আগে

পাহাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই—আপনি আমার ঠিক পেছনে পেছনে আসবেন।

না,—যদি পড়ি ত দু'জনে একসঙ্গে পড়বো—তবেই ত মজা!

প্রভাত বেশ ভয় পাইয়াছিল। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শকুন্তলা বলিল, তার চেয়ে পথের ধারে একটু বসা যাক আসুন, ফগ কেটে গেলে যাওয়া যাবে।

না, আপনার বাবা-মা কত ভাবছেন বোধ হয়। আচ্ছা একটা শব্দ শুনছেন?

ঠিক ঘোড়ার খুরের মত। সত্যি ঘোড়া হলে মুস্কিল, একেবারে ঘাড়ে এসে পড়বে না ত? এবার সাহসিকা একটু ভয় পাইল।

না, ও ঘোড়া নয়। এ ফগে কে ঘোড়া চালাতে সাহস করবে? ও ঝর্ণার শব্দ। আসুন, এই রুমালটা ধরুন, ঠিক আমার পেছনে পেছনে আসবেন।

ফগে সাদা রুমাল ভালো করিয়া দেখা যাইতেছিল না। প্রভাতের শীতল হাতটা শকুন্তলার তপ্ত হাতের ওপর আসিয়া পড়িল। এক হাতে শকুন্তলাকে ধরিয়া, আর এক হাতে পথ দেখিতে দেখিতে ধীরপদে সে চলিল।

চারিদিক স্তব্ধ, নিবিড় ঘন স্নিগ্ধ কুয়াসায় ঢাকা। শুধু বাতাস এই তরুণ পথিকদের সুখকর দুরবস্থা দেখিয়া, ফার্ণ দোলাইয়া বনবৃন্দগুলি কাঁপাইয়া হাসিয়া উঠিতেছে। আর ঝর্ণাধারার অবিশ্রাম হাস্যধ্বনি। শুধু কাপড়-জামার খস্‌খস্‌, পায়ে চলার মস্‌মস্‌, দুইটি বুকের নিশ্বাস প্রশ্বাসের

শব্দ। এতক্ষণ বেশ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল; কিন্তু যখন আঙ্গুলের সহিত আঙ্গুল জড়াইয়া গেল, মুখের সব কথা বন্ধ হইল। শুধু অন্ধকারে অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত মাঝে মাঝে দুই একটি জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল—আস্তে,—দেখবেন,—এই নামছি, —এইখানটা উঁচু—ওদিকে পাথর—আরও এদিকে—আস্তে— ঠিক যাচ্ছি—ভয় নেই—আপনি সাবধান—হোঁচোট খাবেন না—আর মাঝে মাঝে হাসি। অন্ধকারে যখন মুখ দেখা যায় না, প্রতি কথা অতি স্পষ্ট হইয়া ওঠে, গলার সুর যেন সমস্ত দেহকে স্পর্শ করে। মুখে কথা নাই, নদীর ওপরের ঢেউদের মাতামাতি বন্ধ হইল বটে, কিন্তু শান্ত নদীর তলে তলে কি দুর্নিবার প্রমত্ত প্রখর স্রোত বহিতেছে, তাহা কে জানিবে!

এক ঝর্ণার সামনে আসিয়া দুইজনে দাঁড়াইল। প্রভাত বলিল, দেখি, পকেটে একটা দেশলাই ছিল।

দেশলাই বাহির হইল বটে, কিন্তু বাতাসে কিছুতেই জ্বালা গেল না। প্রভাত যতই বারবার ব্যর্থ হয়, শকুন্তলা তত উচ্চ স্বরে হাসিয়া ওঠে। দশ-এগারোটা কাঠি নিষ্ফল হইলে পর শকুন্তলা প্রভাতের হাত হইতে দেশলাই লইয়া শালের আড়ালে দেশলাই ধরাইল, প্রথম কাঠিই জ্বলিয়া উঠিল। সেই দেশলাইয়ের আলোয় প্রভাত দেখিল, কি অপরূপ দ্যুতিময় শকুন্তলার মুখ—যেন একটা ডালিয়া ফুল! এত রাঙা কিরূপে হইল, ফগ লাগিয়া না আনন্দে? কিছুক্ষণ দুইজনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পায়ের তলায় বারিধারা-স্ফীত ঝর্ণা এই যাত্রী দুইটির খেলা দেখিয়া খলখল করিয়া

হাসিতে লাগিল। দেশলাই নিবিয়া গেল। শকুন্তলা আর একটি একটি জ্বালাইলে প্রভাত কাছের দুই-তিনখানি বড় পাথর জলধারার মাঝখানে ফেলিয়া দিয়া, জুতা বাঁচাইয়া পারাপারের ব্যবস্থা করিল।

শকুন্তলার হাত ধরিয়া প্রভাত বলিল, আসুন।

আচ্ছা, আপনার জুতোটা জলে ডোবাচ্ছেন কিসের জন্য?

ও কিছু হবে না। কি সুন্দর ঝর্ণাটা দেখেছেন, যেন এক বিদ্যুতের শিখা।

আপনার শালটা কিন্তু একেবারে মাটি হয়ে গেল।

না, পাথর হচ্ছে!

ঝর্ণার হাসির সঙ্গে তাহাদের সরল মধুর হাসি মিলাইয়া গেল।

আবার দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া স্তব্ধ চলিল। বাড়ীর কাছাকাছি আসতে কুয়াসা অনেক কমিয়া গেল। পথ দেখা যাইতেছিল, তবু তাহারা হাত-ধরাধরি করিয়া চলিল।

বাড়ীর গেটে আসিয়া হাত-ছাড়াছাড়ি হইল। শকুন্তলা এবার একটু আগে আগে চলিল। দরজার নিকটে আসিয়া বলিল, পরশু যে পিক্‌নিক্, ভুলেই গেছলুম। আসছেন ত? প্রভাত নীরবে শকুন্তলার স্নিগ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। শকুন্তলা একটু মাথা নত করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল। তাহার গায়ে যে প্রভাতের শাল রহিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া দিতে আর মনে হইল না।

ঘরে ঢুকিতেই মিসেস রায় বলিলেন, একেবারে ভিজে এসেছিস ত! এবার জ্বর হোক্!

না মা, দেখো, একটুও চুল ভেজে নি।

মেয়ের মাথায় হাত দিয়া মা বলিলেন, সত্যি যে!

মিষ্টার রায়ের দিকে চাহিয়া শকুন্তলা বলিল, ওই ত মজা!

যতীনমামা গাহিয়া উঠিলেন, মজা করে ভিজে এলুম গায়ে জল লাগলো না! কিন্তু এ সব দিকে মনোযোগ দিবার মত মনের অবস্থা শকুন্তলার তখন ছিল না; সে আপনার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সে-রাতে যখন সবাই ঘুমাইয়াছে, প্রভাত বারান্দায় একটি জানলা খুলিয়া চুপ করিয়া বসিল। চাঁদের রূপালী আলো মেঘে ঢাকা পাহাড়ের শিখরে শিখরে, জলে-ভেজা পাইন-গাছগুলির পাতায় পাতায়, জলবিন্দুময় স্নোপ্লাণ্টগুলিতে, বাঁশ-ঘাসের রাশিতে ঝিকিমিকি করিয়া এক মোহন লোক সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রভাত ভাবিতেছিল, আজিকার ঘটনাগুলি যেন কে ঘটাইয়া দিয়া গেল, সে কিছুই করে নাই। তাহার মনের দুয়ারে সে কখনও আগল দেয় নাই, এ ঘর সবার আনাগোনার পথের মত পড়িয়াই আছে। তাই এখানে যে আসিতে চায়, সে নিমেষের মধ্যেই আসিতে পারে, পথ খুঁজিয়া মরিতে হয় না। তাহার এই বাইশ বছরের জীবনে এই মুক্ত-দ্বার-প্রেমালোকিত-হৃদয়-পথ দিয়া কত বন্ধু আসিয়াছে। ক্ষণিকের জন্ত কেহ বসিয়া গল্প করিয়াছে, কত কথা কহিয়াছে; কেহ গান গাহিয়াছে, বীণা বাজাইয়াছে, আবার উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে—তাহাদের গলার সুর, গানের ঝঙ্কার, কথার স্মৃতি কত শরৎ প্রভাতে,

আষাঢ় সন্ধ্যায়, বসন্ত রাত্রে, হঠাৎ বাজিয়া উঠিয়া মন উদাস করিয়া তোলে। পাখীর মত কেহ এক ঋতুতে নীড় রচিয়া অপর ঋতুতে কোথায় চলিয়া যায়; ফুলের মত কেহ প্রভাতে ফুটিয়া উঠিয়া সন্ধ্যায় ঝরিয়া পড়ে। সবাই যে ক্ষণিকের জন্য আসে, আর চলিয়া যায়, এই তাহার বেশ ভালো লাগে, সে কাহাকেও বাঁধিতে চায় না—জীবনের নদী যে বহিয়া চলিয়াছে। শুধু সে ভাবিতেছিল, আজ যে তরুণী তাহার অন্তরের ঘরে চঞ্চল চরণে আসিল, সে যদি হাসিতে হাসিতে ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া বলে, এ আমার ঘর, সবার যাতায়াতের অবারিত পথ নয়,—তবে সে তার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য হইবে? সে যাহাই হউক, সে নিশ্চয় বুঝিল, এই গীত-মুখরা পাখী যদি এখানে নীড় বাঁধিতে চায়, তবে সে সব খড়কুটো আনন্দে জোগাইয়া দিবে।

কি তীব্র আনন্দে তাহার দেহমন ভরিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, পাশের বাড়ীর কোন্ ঘরে, কোন্ কোমল শয্যায় সেই তরুণী শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! অথবা সেও তাহারি মত বিনিদ্র নয়নে চুপ করিয়া জ্যোৎস্না-রাত্রির দিকে চাহিয়া আছে!

পিক্‌নিকের দিন সকালে উঠিয়া প্রভাতের ভয় হইল, এ দিনটা কোনমতে কাটিয়া গেলে যেন সে বাঁচে।

সকালে চা খাইয়া সকলে পিক্‌নিকে যাত্রা করিলেন।

টাইগার হিলে যাওয়া হইবে ঠিক ছিল। যাবার সমস্ত পথ প্রভাত শকুন্তলার নিকটে ধরা দিল না। মিষ্টার রায় ও যতীন-বাবুর সহিত নানা গল্প করিতে করিতে শকুন্তলা হইতে আপনাকে সে দূরে রাখিয়া চলিল। অগত্যা রণেন শকুন্তলার সঙ্গ লইল।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া, কিছু চা-বিস্কুট খাইয়া সকলে চারিদিকে বেড়াইতে বাহির হইল। রণেন বাহাদুরকে লইয়া রান্নার জোগাড়ে চলিল।

প্রভাত আনমনা ঘুরিতেছিল। অদূরে এক গাছের তলায় কতকগুলি কাঠ সাজাইয়া বাহাদুর এক উনান করিয়াছে। শকুন্তলা বড় গাছের ডালগুলি ছোট করিয়া ভাঙ্গিয়া রণেনের হাতে দিতেছে। রণেন সেগুলি উনানে পুরিয়া ফুঁ দিতেছে। তাহাদের সাহায্য করিবে ভাবিয়া প্রভাত একটু অগ্রসর হইল।

ধোঁয়া কাটিয়া দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুনের আভা রণেনের সান্‌প্রুফ কাপড়ের রাইডিং স্যুটে, শকুন্তলার শ্যাম্‌পেন রংএর সাড়ির ওপর পড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল। প্রভাতকে তাহারা কেউ দেখিতে পাইতেছিল না। প্রভাত দেখিতেছিল,—কিসের আলো রণেনের চোখ ভরিয়া নাচিতেছে, কিসের আলো শকুন্তলার চোখ দিয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছে। সে প্রেমের নির্ম্মল আলো, সেখানে একটুও ধোঁয়া নাই, সব মলিনতা কাটিয়া গিয়াছে। প্রভাত আর তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল না। সকালে যে ভয় তাহার মনে হইয়াছিল, তাহা কাটিয়া গেল। এক তৃপ্তির সুখের নিশ্বাস ফেলিয়া সে সম্মুখের ঘন বনে প্রবেশ করিল।

কতক্ষণ সে বনের মধ্যে ঘুরিয়াছিল, তাহা তাহার খেয়াল ছিল না। কখনও মাটি বা পাথর তুলিয়া পরীক্ষা করিতেছিল; কখনও কোন ফার্ণ, লতা ছিঁড়িয়া দেখিতেছিল; কখনও সেই বিজন বন-অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মাথার ওপব গাছে গাছে, শাখায় শাখায় জড়াজড়ি। সহসা পেছনে এক পায়েব শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল—শকুন্তলা।

তুমি ?

শকুন্তলা কি বলিবে! সে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, বেশ, একা বন্ধুকে ধোঁয়া খেতে ফেলে বেখে দিয়ে বনে ঘুবে বেড়ানো হচ্ছে! চলুন, একটু ধোঁয়া খেয়ে কাঁদবেন, তবে ত রান্নার মজা।

প্রভাত কোন উত্তর দিল না, নির্ণিমেষ নয়নে শকুন্তলার অস্বাভাবিক উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শকুন্তলাব দীপ্ত চোখ দুইটি যেন তাহার সমস্ত দেহে বিদ্যুৎ ছড়াইয়া দিল। জোর করিয়া সে আপনাকে দাঁড করাইয়া বাখিল। সে যেন উল্কার মত তাহার দিকে ছুটিয়া যাইবে, তাড়াতাড়ি এক গাছের ডাল ধরিয়া আপনাকে দমন করিল। শকুন্তলা যেন একটু ভয় পাইল, কিন্তু প্রভাতেব চোখের দিকে চাহিতেই মনে হইল, কি নির্ম্মল চোখ দুটি!

দুইজনে গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। প্রভাতের হাতে কয়েকটি লতা ও পাথর ছিল। জিওলজির প্রফেসারের মত সে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিল,—এই হিমালয় কত শত যুগ আগে সাগরের তলায় ছিল। বিবর্ত্তনের পর্ব্বে-

পর্ব্বে পাহাড়দের জন্মকথা সে বলিয়া যাইতে লাগিল। শকুন্তলা মনোযোগী ছাত্রীর মত কথাগুলি শুনিতেছিল বটে, চেষ্টা করিলে অনেক কথা সে বুঝিতেও পারিত, কিন্তু সে কিছু বুঝিতে চাহিতেছিল না, শুধু প্রভাতের স্নিগ্ধ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিতেছিল।

সহসা সন্‌সন্‌ শব্দে গাছগুলি আন্দোলিত হইয়া উঠিল, ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির স্পর্শে যেন তাহারা সহজ মনের অবস্থা ফিরিয়া পাইল। প্রভাত উঠিয়া দাঁড়াইল, শকুন্তলাও তাহার পাশে দাঁড়াইল, বিদ্যুতের মত চোখে চাহিয়া বলিল, আজও বৃষ্টি, আপনি ভাবি বাহুল্যে। দুইজনে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রণেনের গলা শোনা গেল, প্রভাত—প্রভাত! দুইজনে হাসিয়া সমস্বরে চেঁচাইল, এই যে আমরা।

ছাতা লইয়া রণেন ছুটিয়া আসিতেছিল, দুইজনকে এক গাছের গুঁড়িতে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রণেন বলিল, বা, বেশ দেখাচ্ছে, দু'জনেই এক জায়গায়, আমি ভাবলুম তুমি পাথর শিকারে গেছ, আর আপনি ফার্ণ শিকারে।

লজ্জায় রাঙা হইয়া শকুন্তলা হাসিয়া রণেনের দিকে চাহিল। রণেন তাহার পাশে আসিয়া, ছাতা ধরিয়া দাঁড়াইল। বৃষ্টি খুব বেগে আসিল। ছাতার বেশী ভাগটা শকুন্তলা ও রণেনের মাথায় ছিল, আর শিক-ঝরা জলটাই প্রভাতের ঘাড়ে পড়িতেছিল।

রণেন বলিল, আচ্ছা, এতগুলো ছাতা, বর্ষাতি আনা গেল, অথচ বেশ ভিজছেন।

বা, পিক্‌নিকে এসে যদি একটু না ভিজলুম ত হোল কি! রণেনবাবু, কি সুন্দর বৃষ্টি!

কাল প্রভাতের সঙ্গে থাকিয়া গান গাহিবার কথা মনে হইলেও সঙ্কোচ হইয়াছিল, আজ আর শকুন্তলা থাকিতে পারিল না, গান ধরিল। রণেনও তাহার সহিত যোগ দিল। বৃষ্টির শব্দের সহিত পাল্লা দিয়া, তাহারা দীপ্তকণ্ঠে গাহিতে লাগিল। প্রভাত কিন্তু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; দুই চোখ ভরিয়া সেই জলধারার প্রতি চাহিয়া, সে কত কথা ভাবিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, সেই মেঘদূতের কবি কেন দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন, তপোবনের উপবনে ঘটাইয়াছিলেন; কেন তিনি এমনি মেঘ-অন্ধকার-ঘন বারিধারা-মুখর পথের বৃক্ষ-আশ্রয়তলে সে মিলন ঘটান নাই! জগতের আদিম দুষ্মন্তের সহিত আদিম শকুন্তলার কোথায় দেখা হইয়াছিল? সে কোন্ উদার আকাশতলে গিরি-শিখরে, কোন্ হিংস্র-জন্তু-সঙ্কুল বনপথের তরুতলে, কোন্ বারিধারামুখর, স্নিগ্ধ অন্ধকার গহ্বরে! আকাশ, মাটি তাহার সাক্ষী ছিল, আলো-হাওয়া তাহারা পুরোহিত ছিল, বর্ষা-বসন্ত তাহার মিলন-গান গাহিয়াছিল, পুষ্প-লতা তাহার মিলন-শয্যা রচনা করিয়াছিল! জগতের চিরকালের বিরহিণী শকুন্তলার অশ্রুই প্রতি আষাঢ়-আকাশের কালো নয়নে অমিয়া ঝরিয়া পড়ে!

আরও জোরে বৃষ্টি আসিল, ছাতার ওপর কে যেন মৃদঙ্গ

বাজাইতে লাগিল। গান বন্ধ করিয়া শকুন্তলা চেঁচাইয়া লাফাইয়া উঠিল—শিল, শিল—

বন্ধু ছাতাটা ধরো, কিছু শিল কুড়ানো যাক্।

প্রভাত ছাতা ধরিল; কিন্তু যাঁহার মাথায় ধরিল, তিনি সে ছাতা হইতে বাহির হইয়া শিল কুড়াইতে মত্ত হইয়া উঠিলেন।

রণেন বলিল, না—না, আপনি ভিজবেন না, আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি।

প্রভাত বলিল, শীগ্‌গীর ছাতায় আসুন, মাথাটা যদি বাঁচাতে চান।

শকুন্তলা হাসিয়া বলিল, আর আপনার বন্ধুর মাথাটা বুঝি মাথা নয়!

এক গাদা শিল কুড়াইয়া আনিয়া, ছাতার তলায় দাঁড়াইয়া শকুন্তলা ছটফট করিতে লাগিল; নিন—আপনি খান—বলিয়া প্রভাতের হাতে কয়েকটা শিল তুলিয়া দিল।

রণেন খুব বড় কয়েকটা শিল কুড়াইয়া আনিয়া শকুন্তলার হাতে দিল।

বা—আপনি যে সবগুলোই আমায় দিয়ে দিলেন। নিন কয়েকটা—আঃ! কি আরাম টাইগার হিলে বসে শিল খাওয়া!

প্রথম প্রথম শিল কুড়াইতে যে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, কয়েকটা শিল মুখে পুরিতেই সে উৎসাহ চলিয়া গেল। কেহ 'উঃ', কেহ 'আঃ' বলিয়া হাতের শিলগুলি ফেলিয়া দিলেও, মুখের শিলগুলি সবাই আমোদ করিয়া খাইল। অবিশ্রাম শিল পড়িতে লাগিল, রণেন গাহিয়া উঠিল,—

যদি শিলের মত কেক ঝরে পড়ে এইখানে শত শত,

আমি কুড়ায়ে নিতাম, মুখে পুরিতাম, আর কুড়াতাম রে—

শকুন্তলা গাহিয়া উঠিল,—

যদি শিলগুলি হ'ত সন্দেশ ভাই, আর ফার্প লুচির মত,

আমি খাওয়াতাম, সবাইকে ডেকে এনে খাওয়াতাম,

তার পর দুইজনের প্রাণে যেন গানের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। কখনও শকুন্তলা গানের প্রথম লাইন গাহিয়া উঠিল, রণেন পরের লাইন গাহিয়া ওঠে, কখনও দুইজনে এক সঙ্গে গায়। কোন গান আর সম্পূর্ণ গাওয়া হইল না, এক গানের দুই চার লাইন গাহিয়াই নূতন গান গাহিতে তাহারা মত্ত হইয়া ওঠে। প্রভাত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল বটে কিন্তু তাহার দেহের রক্ত প্রতি গানের ছন্দে-তালে বাজিয়া উঠিতেছিল। কত রকমের গান—থিয়াটারের, যাত্রার, ধর্ম্মসঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত, হাসির গান।

শিল পড়া থামিল, বৃষ্টি কমিল। রণেন ছাতাটা প্রভাতের হাত হইতে লইয়া বলিল, চলুন।

প্রভাত বলিল, হাঁ, আপনার মা হয় ত ভাবছেন।

রণেন বলিল, তুমিও চল, ভিজে কাঠ ধরাতে অনেক ফুঁ দিতে হবে।

শকুন্তলা ও রণেন আগে আগে চলিল, প্রভাত ধীরে পেছনে পেছনে চলিল। আজ তাহার অন্তর কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছে।

ইহার পর হইতে প্রভাত এত গম্ভীর হইয়া উঠিল যে

খাবারের সময়ও যতীনবাবু তাহাকে কোন প্রকার ঠাট্টা করিতে সাহস করিলেন না। বাস্তবিক প্রভাতের ভয় হইতেছিল, সে আপনাকে শকুন্তলা হইতে যতদূর সম্ভব দূরে রাখিল। ফিরিবার সময় ফার্ণ কুড়াইবার ছল করিয়া, ধীরে ধীরে সবার পেছনে পেছনে আসিল।

যখন বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াছে, হঠাৎ সে সবাইকে ছাড়াইয়া রণেন ও শকুন্তলাকে ধরিল। তখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়িতেছিল, রণেন শকুন্তলার মাথায় ছাতা ধরিয়া চলিতেছিল।

তাহাদের পাশে আসিয়া প্রভাত বলিল, তোমাদের ছাতায় একটু জায়গা হবে ?

খুব হবে, আসুন, বলিয়া শকুন্তলা তাহাকে পাশে ডাকিয়া নিয়া বলিল, আপনার ফার্ণ কুড়ানো শেষ হোল ? ও, এক গাদা নিয়েছেন যে! শকুন্তলার কুড়ানো ফার্ণগুলি রণেনের হাতে চলিতেছিল। সে সেগুলি প্রভাতের হাতে দিয়া বলিল, বন্ধু, তা'হলে এগুলোও ধরো, পথ আর বেশী নেই।

শকুন্তলা হাসিয়া বলিল, দেখবেন, মিশিয়ে ফেলবেন না!

আচ্ছা, আপনি না হয় বেছে নেবেন; খুব এন্‌জয় করা গেল আজ!

শকুন্তলা রণেনের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার মালাগুলো কেনা হয়েছে ?

রণেন উত্তর দিল, সে ত কাল বিকেলেই কিনে এনেছি। আপনাদের বার্থে সব রিজার্ভ হয়েছে, জিজ্ঞেস করে এসেছি।

প্রভাত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কি ?

রণেন অতি মৃদু হাসিয়া বলিল, কাল মেলে যে ওঁরা যাচ্ছেন।

তাই না কি?—সত্যি?

ম্লান হাসি হাসিয়া শকুন্তলা বলিল, হাঁ, কাল আমরা যাচ্ছি।

চাপা গলায় ও, বলিয়া প্রভাত শকুন্তলার দিকে চাহিল। সে চাউনির মানে এই যে, পরশু যদি এ কথাটা জানতুম, তবে আপনার সঙ্গে এমন করে আলাপ করতুম না। এ বড় অন্যায়!

সকলে বাড়ীর দরজায় আসিয়া পৌঁছিল।

নিন আপনার ফার্ণ, বলিয়া প্রভাত সব ফার্ণগুলি শকুন্তলার হাতে দিল।

আপনার চাই না বুঝি?

না, আমার দরকার নেই।

খুব ভিজেছেন, শীগ্‌গীর কাপড়-জামা ছাড়ুন গে। খুব আমোদে কাটলো—ভারি ভালো লেগেছে—বলিয়া, মৃদু হাসিয়া শকুন্তলা নিজেদের বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল।

'ভারি ভাল লেগেছে,' গানের সুরের মত এই কথাগুলি ঘরের হাওয়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রভাতের কাণে বাজিতে লাগিল। কাপড়-জামা বদলাইয়া প্রভাত চুপ করিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিল। বাহিরে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়িতেছে। চারিদিক কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন। শুধু সামনের গোলাপের ঝাড়, মারগারেট ফুলগুলি, বাঁশ ঘাস বাতাসে দুলিতেছে, কাঁপিতেছে। মনে হইতেছে, মেঘের শুভ্র সাগরে ঘেরা বর্ষা-মুখর এক নির্জ্জন দ্বীপে কয়েকটি

ফুল ঘাস ঝাউগাছ ও একটি গানের সুর লইয়া সে বাস করিতেছে।

সুতীক্ষ্ণ শীতল বাতাস বহিতেছে। ধীরে ধীরে কুয়াসা কাটিয়া বৃষ্টি থামিয়া আসিল। সামনের ছোট পাহাড়ের ওপর পাইনগাছগুলি সাদা সিল্কের ওড়নার মত অতি স্বচ্ছ কুয়াসায় ঢাকা। এই ক্ষান্ত-বর্ষণ নিস্তব্ধ স্নিগ্ধোজ্জ্বল সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া প্রভাত চির-চঞ্চলা প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিল।

বৃষ্টি থামিয়া গেল। চারিদিক হইতে মেঘের আবরণ উঠিয়া আসিতেছে। প্রকৃতি তাহার মুক্ত কবরী দিয়া সমস্ত ঢাকিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল, ধীরে ধীরে মুক্ত বেণী বাঁধিতেছে। সম্মুখের ঘন-বন-সমাচ্ছন্ন পাহাড়ের বুকে একখানি লঘু মেঘ বনদেবীর নির্ম্মল হাসির মত। দূরের পাহাড়গুলি সবুজ মখমলের অঙ্গবাস পরিয়া একে অপরের গায়ে উঁকি মারিয়া যেন সুদূর দিগন্তে ঊর্দ্ধপানে কি দেখিতে চাহিতেছে। আরও দূরে, পাহাড়ের সারির ওপর, মেঘের ফাঁক দিয়া নির্ম্মল সূর্য্যের আলো-ধারা ঝরিয়া পড়িয়া নীলকান্তমণির আভা মাখাইয়া দিয়াছে। সেই ঘন-নীল পাহাড়ের ওপর স্নিগ্ধ নীল মেঘদল খেলিতেছে। উত্তর দিকের কালো পাহাড়গুলি কালো মেঘের সহিত মিলিয়া রাত্রির অন্ধকারের সৃষ্টি করিতেছে। আর পশ্চিমদিকের পাহাড়গুলির কি অপরূপ কান্তি। ঘনশ্যাম পাহাড়ের গায়ে মেঘ-বিচ্ছুরিত সন্ধ্যার রাঙা আলো। পাহাড়ের মাথায় দীর্ঘ বৃক্ষসারির ওপর একখানি নাতিদীর্ঘ মেঘ লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার ওপর সন্ধ্যা-সূর্য্যের রক্তিম ছটা রক্তমেঘের

মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এদিকে চক্রবালের মেঘগুলি পিঙ্গল আভার। তাহার তলার স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ-নীল মেঘপুঞ্জ নীল পাহাড়গুলির সহিত মিলিয়া গিয়াছে।

তলায় রেল লাইনের লোহা ঝিকমিক করিতেছে। তাহার তলায় আলো-ছায়াময় সাদা কার্টরোড যেন আঁকাবাঁকা এক আলোর রেখা। কয়েকটি ভূটিয়া মেয়ে-কুলী গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছে। তাহাদের মুখ দেখা যাইতেছে না, শুধু লাল নীল হল্‌দে জামার রংগুলি জ্বলিতেছে।

পাহাড়ের গহ্বরের গন্ধময় ভিজে মাটি ফুল পাতার সৌরভময় হাওয়া মৃদু বহিতেছে। অতি হাল্কা সাদা ছোট ছোট মেঘগুলি নীল পাহাড়েব গায়ে উঠিতেছে পড়িতেছে দুলিতেছে খেলিতেছে, মুক্তার হাবেব মত কেহ মাথায, কেহ বুকে, কেহ পায়ে জড়াইয়া আছে, যেন হীবা-মণি-মাণিক্যেব ভারে বিজড়িতা নীলবসনা সুন্দরীরা স্থির হইয়া দাড়াইয়া আছে, গায়ে মালার পব মালা দুলিতেছে।

মল্লিকাফুলের মত সাদা কয়েকখানা মেঘ মৃদু বাতাসে উড়িয়া যাইতেছে। কেহ যেন এক বলাকা, কেহ শুভ্র তরী, কেহ অবগুণ্ঠিতা নারী। প্রতি মেঘ বহুরূপী—কখনও নানা রংঙের মন্দির, কখনও একরাশ তুলা, কখন কখনও প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনও অদ্ভুত জীব, কখনও অতি সুন্দর হাল্কা বরফের পুঞ্জ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। চা-বাগানের লালবাড়ী আর দেখা যাইতেছে না। উত্তর দিকে মাঝে মাঝে

বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। মেঘের গম্ভীর গর্জ্জন শান্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কুলীমেয়েদের গান আর শোনা যাইতেছে না। নিত্য দীপালি-উৎসবময় দার্জ্জিলিঙের বাড়ীগুলি আর দেখা যাইতেছে না। শুধু বনের অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে থাকে-থাকে-সাজান প্রদীপের সারি,—যেন কোন সহস্রাক্ষ অতি বৃহৎ দৈত্য চুপ করিয়া শুইয়া আছে।

দিক্-চক্রবালের মেঘগুলি নামিয়া পাহাড় ছাইয়া ফেলিতেছে। সাদা মেঘগুলি কৃষ্ণাভ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বের পাহাড়গুলি মেঘের কম্বল মুড়ি দিয়া রাত্রে ঘুমাইবার আয়োজন করিতেছে; পশ্চিমের পাহাড়গুলির সে দ্যুতিময় কান্তি কৈ? রঙের খেলা শেষ করিয়া রঙের তুলি মুছিয়া একাকিনী সন্ধ্যা কালো মেঘের আড়ালে লুকাইয়া চলিয়া যাইতেছে। তলা দিয়া ছোট রেলগাড়ী ঝক্‌ঝক্ করিয়া চলিয়া গেল—যেন একটা কাল সাপ মাথায় মণি জ্বালাইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড় দিয়া নামিয়া গেল।

আবার সব সাদায় সাদা হইয়া কুয়াসায় ঘিরিয়া আসিতেছে। সুতীক্ষ্ণ শীতল আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। চারিদিকে থর থর সন্ সন্ সর্ সর্ শব্দ। দক্ষিণে একটু চাঁদের আলো, কিন্তু উত্তরে বিদ্যুতের ঝিল্‌কি, বজ্রের গর্জ্জন,—সব যেন এক রহস্যময় মায়া, অবাস্তব ছায়া, আলো-ছায়া-ঘন মাধুর্য্য, আঁধারের খেলা। আবার ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল।

সুদীর্ঘ সন্ধ্যা ভরিয়া প্রভাত এ চিরচঞ্চলা প্রকৃতির নব নব শোভা দেখিতে লাগিল। তাহার অন্তর আজ বিপুল আনন্দে

উচ্ছ্বসিত হইয়া কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তবু কি অজানা গোপন বেদনা তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল—ওই ভিজে মাটির উপর ঘাসের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া লুটাইয়া কাঁদিতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়।

এ কিসের তৃষ্ণা? কিসের কান্না? এ গোপন-রহস্যময় অপরিচিত বেদনা যেন অর্দ্ধেক তাহার পিয়াসী মনের সৃষ্টি, আর অর্দ্ধেক এই বাহিরের জল-স্থল-আকাশের মায়া। হঠাৎ তাহার মনে হইল, আজ যেন ১লা আষাঢ়। 'পাঁজিতে আজ যে মাসের যে তারিখই থাক না, তাহার মানস-আকাশে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে জগতের চিরন্তন যক্ষ তার বিরহিণী প্রিয়ার জন্য ব্যথিত হইয়া আপন বীণা লইয়া বসিয়াছে। পৃথিবীর সেই চিরকালের যক্ষের অশ্রু তাহার সমস্ত অন্তরাকাশ জুড়িয়া জমিয়াছে। এ ধারা অঝোরে ঝরিয়া পড়িলে সে বাঁচে।

কোথায় সে প্রিয়া? কাহার জন্য এ অশ্রু? এ যেন কোন রক্তমাংসের নারীর জন্য নয়,—এ কোন অজানা কোন অলকাবাসিনী অনন্তযৌবনা চিরসৌন্দর্য্যময়ীর জন্য। কোথায় সে অলকা? সে কি তাহার চিত্তের মর্ম্মস্থলে—সে বিরহিণী কি অন্তর-কমলের স্বর্ণ-পাপড়ির শয্যায় সুপ্ত হইয়া আছে? অথবা সে সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মিলাইয়া-মিশাইয়া ছড়াইয়া লুকাইয়া জলে-স্থলে আকাশে আপনাকে মুক্ত বিকম্পিত শিহরিত চঞ্চল করিয়া ক্ষণে ক্ষণে কোন্ অজানা মুহূর্ত্তে দেহ-মন স্পর্শে উন্মনা করিয়া যায়, তৃষিত ব্যথিত দীপ্ত আনন্দিত করে। ওই গোলাপকুঞ্জ,

ফিউসিয়া ক্যাকটাস ফুলদল হইতে এই ভিজে মাটির গন্ধে তাহারি অঙ্গের সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে। স্নিগ্ধ নীল পাহাড়ের ওপর তাহারি নীলবাস লুটাইয়া পড়িয়াছে। ওই পশ্চিম দিকের পাহাড়ের মাথায় রঙীন মেঘে তাহারি স্বপ্নময় চাউনি। ওই কালো মেঘের রাশি তাহারি কালো কবরী। দক্ষিণ কোণের মেঘ সরিয়া নীল আকাশে তাহারি অঙ্গের লাবণ্য দেখা যাইতেছে। এই পাহাড়ের কোলের মেঘগুলি বুঝি তার অন্তরের লীলা, তাহার খুসি, তাহার হেলাফেলা। তাহার ক্ষণিক বেদনা, হাস্য, অশ্রুজল এই নব-নব রূপী মেঘের খেলার মূর্ত্তি ধরিতেছে। জিয়লজিতে সে যে পৃথিবীর ইতিহাস জানিয়াছে তাহা তাহার নিকট ভুল বোধ হইল; এ কেবল অগ্নি জল পাথর মাটির বিবর্ত্তনের ইতিহাস নয়—এ পৃথিবী যেন কোন উর্ব্বশীর নব-নব বিকাশ, সে অনন্তসৌন্দর্য্যময়ী অনন্ত-যৌবনার যুগে-যুগে ক্ষণে-ক্ষণে নব-নব রূপের ধারা।

রণেনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয়ই হাসিয়া বলিত, এ ব্যথা হচ্ছে শকুন্তলার জন্য বিরহ-বেদনা। প্রভাত যে এ কথা ভাবে নাই, তাহা নহে; তবু তাহার মনে হইতে লাগিল, এ বেদনার সহিত শকুন্তলার যোগ আছে অথচ নাই।

কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যায় মন যে এমন উল্টা সুরে গাহিবে, তাহা কে জানিত।

দুপুরের মেলে রায়-পরিবারকে গাড়ীতে চড়াইয়া বিদায় দিয়া দুই বন্ধু বাড়ী ফিরিল। ষ্টেশন হইতে বাড়ী আসিবার সমস্ত পথ প্রভাত অতি অস্বাভাবিক ভাবে হাসিতে হাসিতে আসিয়াছে, পথে যেখানে যে-কোন প্রকার হাস্য উদ্রেকের বস্তু পাইয়াছে তাহার যথোচিত ব্যবহার হইয়াছে—কোন মোটা লোক, অতি রংকরা মুখ, কোন বাঙ্গালী-সাহেবের অদ্ভুত সাজ, কোন ছোকরা বাঙ্গালীর ষ্টাইল। কিন্তু বাড়ী পৌঁছিতেই তাহার হাসির ভাণ্ডার যেন ফুরাইয়া গেল, কোন মতে দুই বন্ধু চা খাইয়া বারান্দায় আসিয়া বসিল।

রণেন হারমোনিয়ম বাজাইতেছিল। প্রভাত একটু রুক্ষ স্বরে বলিল, আর প্যান-প্যান করিস নে ভাই—

কেন? হঠাৎ হারমোনিয়মের কি দোষ হল? ভালো লাগছে না? দেখ, কি সুন্দর বাইরেটা হয়েছে!

দেখিছি, দেখিছি—একটু চুপ কর।

কি হল হে?

আচ্ছা, তোর গান গাইতে ভালো লাগছে?

বাস্তবিক রণেনের গান গাহিতে মোটেই ভালো লাগিতেছিল না, সে গানও গাহিতে ছিল না, মনটা ভুলাইবার জন্য হারমোনিয়ম বাজাইতেছিল; কিছুক্ষণ বাজাইয়া বন্ধুর ওপর দয়া করিয়া বন্ধ করিল। তারপর সে মালিকে ডাকিল, একটা কোদাল আনাইল, সামনের জায়গাটায় ফুল গাছ

বসাইতে হইবে বলিয়া মিছামিছি নিজেই খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

গার্ড যখন হুইসিল দিল, ট্রেণ নড়িয়া উঠিল। রায়-পরিবারের সকলকে নমস্কার করিয়া প্রভাত একবার শকুন্তলার দিকে চাহিল শকুন্তলার নির্ম্মল উজ্জ্বল হাসিভরা ব্যথাভরা কালো-চোখ দুইটি নিমেষের জন্য তাহার চোখের ওপর আসিয়া পড়িল। সে নিমেষ তাহার পক্ষে অনন্ত ক্ষণ। সেই বিদায়ের চাউনি তাহাকে কি বলিয়াছিল?

প্রভাত ভাবিতেছিল,—সে চাউনি কি বলিল, ভারি ভাল লেগেছে, এই দার্জ্জিলিঙের দিনগুলি, এই বৃষ্টিতে ভেজা, শিল খাওয়া, ফগে পথ হারান, ভারি ভালো লেগেছে। আর তাহার চোখ দু'টি উত্তর দিল, আমারও খুব ভাল লেগেছে,—তোমার হাসি, তোমার থাকা, তোমার গান, তোমার চাউনি, এই পথে চলা, কথা বলা বসে ভাবা।

. সে চাউনি কি বলিল, মনে রেখো, ভুলো না বন্ধু, ভুলো না। আর তাহার চোখ উত্তর দিল, ভুলো না বন্ধু, তুমিও মনে রেখো,— জীবনে যদি কখনও বন্ধুরা ছেড়ে যায়, কোন বন্ধুর দরকার হয়, এ বন্ধুকে ডাকতে ভুলো না।

সে চাউনি কি বলিল, তবে বিদায় বন্ধু, বিদায়, আর তাহার চোখ উত্তর দিল, আমার এ খোলা ঘরে হাসি-গানে আকুল করে ক'দিন তুমি বাসা বেঁধে আজ অশ্রুজলে ভিজিয়ে চলে যাচ্ছো—এর সব দুয়ার সব সময় তোমার জন্য খোলা থাকবে— যে দুয়ার দিয়ে যখন খুসি এসো।

সে-চাউনির কত অর্থ ভাবিতে ভাবিতে সে সন্ধ্যা-স্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল। রণেনও কোদালে বেশীক্ষণ মন দিতে পারিল না, সামনের রাস্তায় একা বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

রাতে দুই বন্ধু সকাল সকাল আলো নিবাইয়া বিছানায় শুইল বটে কিন্তু কাহারও চোখে ঘুম আসিল না। দুইজনেই চুপচাপ, এ যেন ভাবে ও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া থাকিয়া প্রভাত ডাকিল, রণেন! দ্বিতীয় ডাকে সে সাড়া দিল, কি?

প্রভাত কি জিজ্ঞাসা করিবে তাহা ঠিক খুঁজিয়া পাইতেছিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বলিল, আচ্ছা, ওঁরা বড় শীগ্‌গির গেলেন।

ভালোই হল ভাই।

কেন বল তো?

আর কিছুদিন থাকলে একটা কিছু ঘটেও যেতে পারত, একটা হেস্তনেস্ত—

তাই না কি,—আমি অতদূর ভাবি নি।

এই স্তব্ধ অন্ধকারে পাশাপাশি ঘরের বিছানায় শুইয়া চুপে চুপে কথা বলার মধ্যে শুধু রহস্য নয়, মাধুর্য্যও আছে, প্রতি কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ হইয়া বাজে।

রণেনের ব্যথিত কণ্ঠস্বরে প্রভাত বলিল, আমায় পরশু যদি বলতে—

হাঁ তোমায়? আর বোলো না।

প্রভাত ভাবিল বাস্তবিক, কয়েকটি দিন, কয়েক ঘণ্টা,—

কিন্তু এই তার জীবনকে ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে। সে ধীরে বলিল, আমার মনে হয় ভাই, ও সমস্ত জিনিবটা অতি সরল সহজ ভাবেই নিয়েছে, যেমন আর দশজনের সঙ্গে মেশে—

আমার ত তা' মনে হয় না, এত যত্ন করে খাওয়াত।

আমি আমার কথাই বলতে পারি—তোমার কথা কেমন করে বলব। দেখো, অমন সরল ভাবে খেলা, সহজ ভাবে কথা বলা ওর স্বভাব—তুমি ভুল করছ।

ভুল করতেই আমি রাজি আছি।

তাই না কি—তা' হলে, বল—

ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

একটা মোহও ত হতে পারে,—ভেবে দেখ।

দেখি ভাই, এখন ঘুমোও।

দুইজনে চুপ করিল। তাহাদের কথাগুলি অন্ধকারে ঘুরিতে লাগিল; আর তার সঙ্গে এক মিষ্টি হাসির সুর। প্রভাত ধীরে বিছানা হইতে উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে ঝোড়ো হাওয়া হা-হা করিয়া ডাকিতেছে। প্রতিপদের চাঁদ কয়েকটি তারা লইয়া আকাশের এক নীল কোণ উজ্জ্বল করিয়াছে। অপর দিকে কালো মেঘের পুঞ্জে বিদ্যুৎ ঝলসিছে।

পরদিন সকালে রণেন তাহার বাগান লইয়া পড়িল। প্রভাত তাহার থিসিস লইয়া বসিল। কিন্তু রণেনের কোন নতুন গাছ পোঁতা হইল না, প্রভাতেরও কিছু লেখা হইল না।

সমস্ত দিন দুইজনেই চুপচাপ। দুপুরে প্রভাত বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পাশের বাড়ীর খালি ঘরগুলির মধ্যে গিয়া পড়িল। শূন্য টেবিল চেয়ার তক্তা পড়িয়া রহিয়াছে। কোথাও ছেঁড়া চিঠির কয়েকটি পাতা, কোন কোণে শুকনো ঝরা ফুলের পাপড়ি, কোন দিকে কয়েকটা দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি,—তাহারা সব যেন নড়িয়া এক মধুর হাসির সুরে নাচিয়া উঠিল।

ফিরিয়া গিয়া প্রভাত রণেনকে বলিল, তুমি কি আমায় একটা ভূতের বাড়ীতে রেখে দিতে চাও?

কি হল বন্ধু?

সারাদিন তোমার দেখা নেই, একটা কথা কইতে পাই না।

এত দিন কোন দুপুরে আমার দেখা পাও নি, খোঁজও কর নি

না ভাই, এখানে থাকলে আমার পড়াশুনা হচ্ছে না; কলকাতা যেতে চাই।

সেই পাহাড়ের মালা, সেই মেঘের খেলা, সেই সন্ধ্যার সাতরঙের আলো। শুধু বৃষ্টি একটু বেগে রুদ্ধ দুর্নিবার ক্রন্দনের মত ঝরিতেছে, বাতাস করুণ অস্ফুট আর্তনাদের মত বহিতেছে, রাত্রির কালো আঁচলের ভিতর সন্ধ্যার রঙীন আলো অতি শীঘ্র মিলাইয়া যাইতেছে।

কালো মেঘের মধ্যে সন্ধ্যার শেষ স্বর্ণ-রেখা মিলাইয়া গেল ; প্রভাত রণেনকে বাগান হইতে ধরিয়া আনিল।

ভাই, একটু গান গাও না,—তোমার একটা বাঁশী ছিল না ?

অনেক খুঁজিয়া একটা বাঁশী বাহির হইল। প্রভাত বাঁশী বাজাইতে লাগিল, আর রণেন গান ধরিল। যে সব গান সে কত যত্নে শকুন্তলাকে শিখাইয়াছে, কত আনন্দের সহিত শকুন্তলার নিকট হইতে শুনিয়াছে, একের পর এক করিয়া সে গানগুলি গাহিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সব গানের সুরই কি করুণ, সে আসোয়ারী হউক আর পূরবীই হউক, বেহাগই হউক আর মালশ্রীই হউক, সকল সুরই যেন কান্নাভরা। গানের কথাগুলির কত নতুন নতুন অর্থ তাহাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইল,—কোনটি গজল, কোনটি ভজন, বাউলের সুর, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়াল, চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথের কত গান। বাহিরে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না গোলাপকুঞ্জে ঝরিয়া পড়িয়াছে। মেঘ-লোকের দিকে চাহিয়া প্রভাত সুরে সুরে বাঁশী ভরিয়া দিল।

সবশেষে প্রভাত একটী গানের সুর গাহিয়া উঠিল,—আমার একটি কথা বাঁশী জানে, বাঁশীই জানে!

রণেন হাসিয়া বলিল, কি কথা বন্ধু ?

এতক্ষণ ত এত সুরে সেই কথাই বললুম।

তাই না কি !

দুইজনে কিছুক্ষণ চুপ করিল।

রণেন জিজ্ঞাসা করিল, তা' হলে তুমি কাল সত্যি যাচ্ছো ?

আচ্ছা কালকের দিনটা থেকে যাওয়া যাক, তুমি কি ঠিক করলে?

বুঝে উঠতে পারছি না।

ঠিক বলো—তা' হলে কলকাতায় গিয়ে দেখা করব। কি, চুপ করে রইলে যে! আমি গেলে ভয় আছে, উল্টো ফলও হতে পারে? সত্যি বলো।

হাঁ ভাই, তুমিই বল, তোমার ভয়টা নেহাৎ মিথ্যে নয়।

আমি ত তাই ভাবছিলুম, মনে মনে ঠিকই করেছিলুম, গিয়ে দেখা করব না।

কিন্তু তুমি!

ও, হাসালে। কি জানো? সায়েন্স ইজ গাই ব্রাইড বুঝলে! তোমার মিলনের পথে কোন ভয় নেই ভাই।

কি যা-তা বলিস!

রণেন ভাবিল, প্রভাত কি সত্যই শকুন্তলাকে ভালবাসিয়াছে? ভালবাসাই ত তাহার প্রকৃতি, হয়ত তাহার চেয়েও বেশী ভালবাসিয়াছে। হঠাৎ একটা গানের দুই পদ মনে পড়াতে, সে মনে মনে হাসিয়া উঠিল—

"দেখো সখা ভুল করে ভালবেসো না,
আমি ভালোবাসি বলে তুমি বেসো না।"

আর প্রভাত ভাবিতেছিল, রণেন নিশ্চয় তাহার চেয়েও অনেক বেশী শকুন্তলাকে ভালোবাসে, তাহার সহিত মোটে ত ক'দিনের আলাপ।

জ্যোৎস্না-ধোয়া গোলাপ-ঝাড়ের দিকে চাহিয়া দুইজনে চুপ

করিয়া বসিয়া রহিল। বাঁশী ও গান থামিয়া গিয়াছে। তাহার সুর ঘরের হাওয়ায় ঘুরিয়া বাজিতে লাগিল।

তিন বছর কাটিয়া গিয়াছে। অকল্যাণ্ড রোডের সেই বাড়ীব সেই হট্-হাউস। ফিউসিয়া ঝাড়টি আরও বড় হইয়াছে। তাহার তলায় শকুন্তলা দাড়াইয়া, শকুন্তলাকে আগেকার চেয়ে বড় দেখাইতেছে। তাহার দেহে যেন যৌবনের জোয়ার ভরিয়া আসিয়াছে। কোলে একটি ছোট শিশু। সম্মুখে মুখোমুখি প্রভাত দাড়াইয়া এই কল্যাণী মাতৃমূর্ত্তির স্থির সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। স্নিগ্ধস্বরে প্রভাত বলিল, বা শুকু, তোমায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, প্রথম যেদিন এখানে তোমায় দেখেছিলুম, তার চেয়েও সুন্দর।

শকুন্তলার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। চুপ করিয়া সরল চোখে একবার কোলের শিশুটির দিকে একবার প্রভাতের দিকে চাহিল। প্রভাত তাহার কোল হইতে ছোট শিশুটিকে কাড়িয়া লইয়া আদরে ভরিয়া দিল। শিশুটি হাসিল, তার পর কাঁদিয়া উঠিল। প্রভাত নিজ পকেট হইতে সোনার ঘড়িটি তাহার হাতে খেলিতে দিয়া বলিল, কি নাম রাখছ এর?

তুমিই বল না।

এর ভালো নাম যা খুসী রাখো, এর একটা ডাক-নাম রাখবে, ডালিয়া। তাহার মনে পড়িল, এক কগাচ্ছন্ন অন্ধকার

সন্ধ্যায় এক ঝর্ণার ধারে দেশলাইয়ের আলোয় কাহার মুখ ডালিয়া ফুলের মত সুন্দর দেখিয়াছিল।

ঘড়ি লইয়া দেখিতে দেখিতে খুকী সেটি নীচে ফেলিয়া দিল। শকুন্তলা লজ্জিতভাবে ঘড়িটি ধীরে তুলিয়া প্রভাতের হাতে দিতে আসিল।

ঘড়ির কাঁচ ফাটিয়া গেল, কিন্তু ঘড়িটি ভাঙ্গিল না। টিক্ টিক্ শব্দে চলিতে লাগিল।

হাসিয়া রণেন হট্-হাউসে ঢুকিল।

ওহে, তোমার ষ্টীমার ৩রা ছাড়বে, খবর দিয়েছে।

তাড়িয়ে দিতে পারলে বাঁচো, নয়?

কি জানি, যদি শকুন্তলাকে নিয়ে ইলোপ করো?

শকুন্তলা স্বামীর মুখের দিকে রাগিয়া চাহিয়া বলিল, যাও—

যাচ্ছি, বলিয়া রণেন হট্-হাউস হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রভাত দেখিল, শকুন্তলার চোখে একবিন্দু জল টলমল করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি খুকীকে শকুন্তলার কোলে দিয়া ঘড়িটি শকুন্তলার হাত হইতে খুকীর হাতে দিয়া বলিল, বাস্তবিক, রণেনটা কি দুষ্টু!

চোখের জল সামলাইয়া শকুন্তলা বলিল, তোমার থিসিসটা শেষ হয়েছে?

এক রকম ত শেষ করেছি।

আসছে বছর ত গেলে পারতে।

আবার শুনছি, এক জার্ম্মাণ না কি আমার থিওরি নিয়ে কাজ করছে, বিলেতে গিয়ে ঠিক খবর পাবো, তাড়াতাড়ি যাওয়া চাই।

রণেন আবার ঢুকিয়া বলিল, এমন সুন্দর বাইরেটা হয়েছে! কি সব চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছ! চল ভাই, একটু বেড়িয়ে আসি।

প্রভাত খুকীকে কোলে লইল। প্রভাত ও রণেনের মধ্যে শকুন্তলা চলিল। ধীরে তাহারা অকল্যাণ্ড রোডে বেড়াইতে গেল।

কয়েকদিন পরে। আনমনা শকুন্তলা প্রভাতের কথা ভাবিতে বসিল। দুপুরের মেলে প্রভাতকে বিদায় দিয়া আসিয়াছে। সে বিলাত যাইতেছে। ফিরিবে কি ফিরিবে না, কে জানে।

বিদায়-বেলায় বন্ধুর করুণ-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কি কথা ছিল? সে যেন বলিয়াছিল, সুখে থাকো, তোমরা সুখে থাকো, তোমাদের ঘর যেন দিন-রাত হাসি-গানে ভরা থাকে।

ধীরে শকুন্তলা খুকীকে বুকে করিয়া চুমা খাইল। দুই বিন্দু অশ্রু খুকীর হাসিভরা মুখে ঝরিয়া পড়িল।

রণেন আসিয়া ধীরে ঢুকিল, শকুন্তলার পাশে দাঁড়াইয়া হাতের উপর একটুখানি হাত রাখিল, বলিল, এসো, একটু গান গাওয়া যাক।

শকুন্তলা খুকীকে রণেনের কোলে দিয়া ম্লান মৃদু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না চলো, ভারি সুন্দর সন্ধ্যেটা হয়েছে, বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি।

দার্জ্জিলিং-সন্ধ্যার অপরূপ আলো চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

১৩২৮

বেনামী

ভাবিয়াছিলাম, বলিব না। জীবনের পর্দ্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে যে অতি-সূক্ষ্ম অপরূপ ভীষণ-মধুর বেদনার জাল রচিত হইয়া থাকে, ভাবিয়াছিলাম, জীবনশিল্পীর সেই সুখদুঃখের বিচিত্র রঙীন তন্তুময় আশ্চর্য্য কারুকার্য্য রহস্যের যবনিকা দিয়া চিরকাল ঢাকিয়া রাখিব। কিন্তু বলিতে হইল, বেদনার যবনিকা সরাইয়া অন্তরের রহস্য-শিল্প প্রকাশ করিতে হইল।

আমার বাড়ী যে দেখিয়াছে, সেই বলিয়াছে এ থাকিবার বাড়ী নয়, এ বইয়ের গুদাম। বাস্তবিক, বইয়ের ইট দিয়া আমার ঘরের দেওয়ালগুলি তৈরী বলিয়া বোধ হয়। এই গ্রন্থ-স্তূপের গুরুভার বহিতে হয় বলিয়াই বোধ হয়, মস্তক অনাবশ্যক চুলগুলি ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এ বিরলকেশ মস্তক এ বোঝা বহিতে পারিত না যদি অন্তরের মর্ম্মস্থলে সবার অগোচরে একটি প্রেমপদ্ম অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত হইয়া না থাকিত। মাঝে মাঝে ভাবি, এ পদ্ম যে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হয় নাই সেই আমার জীবনে পরম লাভ; যদি হইত, কে জানিত ক্ষণিক সৌরভ সৌন্দর্য্যের মাদকতার পর সকল রূপ গন্ধ দক্ষিণ সমীরে দিকে দিকে ছড়াইয়া হঠাৎ সে দেউলিয়া হইয়া যাইত না, তাহার রাঙাপাতাগুলি কালো হইয়া আসিয়া কোনো শুভ্র রাতে তারার আলোয় ধীরে ধীরে ঝড়িয়া পড়িত না? কিন্তু এই অর্দ্ধবিকশিত কমলের ঝরিয়া পড়িবার ভয় নাই, ইহার গন্ধ সর্ব সময়ে পাই,

অন্তরের মর্ম্মতন্তুনাল দিয়া অহর্নিশি ইহাকে জড়াইয়া রাখিতে হয়। ভাবিয়াছিলাম, জীবনের প্রেমগুহাস্থিত শ্রেষ্ঠ ধন শুধু মৃত্যুর অমল হাতে রাত্রির অন্ধকারে প্রদীপের মত দিয়া যাইব। কিন্তু প্রকাশ করিতে হইল। বেণু এমন কাণ্ড বাধাইয়াছে যে তাহার জীবন পূর্ণ করিবার জন্য আমার জীবনের অপূর্ণতা উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল।

শীতপ্রভাতে উজ্জ্বল রৌদ্রের স্নিগ্ধ উত্তাপ দুই পায়ে মধুরভাবে অনুভব করিতে করিতে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়া একখানি স্প্যানিস্ নভেল খুলিয়াছি, এমন সময় পেছন হইতে কে আসিয়া চোখ টিপিয়া ধরিল। এ চম্পক-অঙ্গুলির কোমল স্পর্শ যে কাহাব হস্তের তাহা বেশ জানিতাম; সে ভিন্ন এ প্রৌঢ় প্রফেসারের গ্রন্থপাঠক্ষীণ চক্ষু টিপিবার লোভ আর কাহারও নাই। এ চোখ দুইটি আজীবন কত শত শত বইয়ের পাতায় পাতায় কালো আঁচড়ে আঁচড়ে কত সুন্দরীর সহিত ঘুরিয়া জীবনের কত নব-নব রূপের সন্ধান পাইয়াছে, যেন দুই প্রদীপ জ্বালাইয়া কাহাকে সে গ্রন্থে গ্রন্থে খুঁজিয়াছে, কত দৃশ্য দেখিয়া কত চিন্তা করিয়া সুধাহলাহলময় রঙীন মায়ায় পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তবু তৃষ্ণাতুরের যাত্রার বিরাম নাই। যখন চির-অনুসন্ধিৎসু কালো চোখ দুইটির উপর এই কিশোরীর আঙুলের স্পর্শ আসিয়া সেতারের তারের মত বাজে, মনে হয় সেই অজানা রহস্যময়ী ক্ষণিকের জন্য তাহার আঁচল ঠেকাইল।

চুপ করিয়া আছি দেখিয়া বেণু চোখ দুইটি জোরে চাপিয়া ধরিল। হাসিয়া বলিলাম, সুরেশ, ছাড়।

যাও, বলিয়া চক্ষু ছাড়িয়া গম্ভীর হইয়া সে আমার মুখের দিকে তাকাইল। এই পরিহাসটি আমাদের মধ্যে কিছুদিন প্রচলিত হইয়াছে। সুরেশ নামক কোন এম-এ বি-এল যুবকের সঙ্গে বেণুর বাবা তাহার শুভপরিণয় স্থির করিতে উদ্যোগী আছেন, তাই এই ঠাট্টা।

কিন্তু আজ বেণুর মুখ একটু অস্বাভাবিক গম্ভীর বলিয়া বোধ হইল। তীর-ছোড়া ধনুকের ছিলার মত তাহার ভ্রূ যখন কম্পিত হইয়া উঠে, তখন আমারও ভয় হয়, এবার চক্ষু হইতে না জানি কোন বাণ চারিদিক কথার আগুনে আলো করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রের মত বাহির হইবে,—তাহার মায়ের স্বভাব আমি বেশ জানি। সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম, দেখিলাম, কুঁচফলের মত তাহার রক্তিম গণ্ডের কৃষ্ণতিলটি স্থির হইয়াছে; ভরসা করিয়া হাসিয়া বলিলাম, এত সকালেই আবির্ভাব যে?

কেন, আসতে নেই বুঝি, বলিয়া সে পাশের রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ভুটিয়া ভৃত্যটি ইলেকট্রিক ষ্টোভে জল গরম করিয়া কি তৈরী করিতেছিল। বেণু তাহার অপরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে নানা মন্তব্য, তাহার বুদ্ধিহীনতা সম্বন্ধে নানা ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে ঘর হইতে তাড়াইয়া নিজেই রুটি টোষ্ট ও কোকো তৈরী করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

বুঝিলাম, আজ বিশেষ কিছুই খরচ হইবে। বায়োস্কোপে কোনো নূতন ভাল ফিল্ম্ আসিল কি, কাগজে কি কোনো ফরাসী গ্রন্থকারের কোনো নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন বাহির

হইয়াছে, অথবা নিশ্চয়ই কোন চতুর দোকানদার পথের ধারে শো-কেসে খুব ভালো শাড়ী সাজাইয়া রাখিয়াছে, বন্ধুদিগের বুঝি কোথাও পিক্‌নিক্‌ বা ষ্টিমার ট্রিপ দিবার কথা আছে, অথবা কোনো মেয়ের হঠাৎ পারিবারিক দুরবস্থার জন্য পড়াশুনা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, কোনো খোড়া, কুকুর, রুগ্ন বিড়াল বা মা-হারা পাখীর ছানা বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে কি? আজ সকালে এই কোকো রুটি টোষ্টের ঘুস দিয়া কি আদায় হইবে ভাবিতে লাগিলাম। ইহাকে ঘুস বলিতে বেণুর রীতিমত আপত্তি আছে, সে সত্যই চটিয়া উঠে, তাহার বাবা মা'র সঙ্গে তর্ক করে, ঘুস সে দেয় না, আমি দিই। আচ্ছা, আমি সত্য কথা বলিব। অবশ্য, সত্য কথা বানাইয়া বলিব। মনে মনে আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই ঘুস দিই।

কোকো রুটি লইয়া বেণু শীঘ্রই হাজির হইল। মার্বেল পাথরের ছোট গোল টেবিল হইতে বইগুলি টানিয়া মেজের কার্পেটের উপর ফেলিয়া দিয়া খাবার সাজাইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কোকোর কাপে এক চুমুক দিয়া বলিলাম, বা, এত কম চিনি দিয়ে যে কোকো এত মিষ্টি হতে পারে জানতুম না! তোর হাতের কি গুণ. ও ভুটিয়ারত্ন কত চিনি যে ঢালে তবু এমন মিষ্টি ত কোনদিন হয় না।

সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আমার খাওয়া দেখিতে লাগিল। বলিলাম, তুই কিছু খা, দাঁড়িয়ে রইলি!

বেণু ধীরে সোফায় বসিয়া আবার উঠিয়া সামনের টেবিলের স্তূপীকৃত বইগুলি সাজাইতে আরম্ভ করিল। অন্যদিন সকালে বেণু যখনই আসে, সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। খাও বলিতে হয় না, নিজেই কোথায় বিস্কুটের টিন সন্দেশের হাঁড়ি আছে বাহির করিয়া আনে; চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়া পয়সা বাহির করিয়া বাহাদুরকে গরম গরম জিলিপি বা তেলে ভাজা খাবার আনিতে আদেশ করে। আজ তাহার কি হইল? মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যেন কি রহস্যমাখা, একটু বিবর্ণ শুষ্ক বলিয়া বোধ হইল। বলিলাম, অসুখ করেছে, না ঝগড়া করেছিস্, রাতে ঘুম হয়নি?

আমার দিকে না তাকাইয়া বলিল, হাঁ।

আশ্চর্য্য হইলাম, আমারও গত রাত্রে ভালো ঘুম হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন রে?

আমার দিকে কটাক্ষে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, ভেবে ভেবে।

তাহার এই হাসিটি বড় মিষ্ট লাগে। ছোট ঠোঁট দুইটি বাঁকিয়া কাঁপিয়া উঠে, কপোল ফুলিয়া গোল হয়, যেন কুঁড়ি ফাটিয়া গোলাপফুল ফুটিল—তাহাকে খুব সুন্দর দেখায়।

তবু শঙ্কিত হইয়া বলিলাম, তোর কিসের ভাবনা?

চুপ করিয়া রহিল। বুঝিলাম, প্রশ্নটা অবশ্য অর্থহীন হইয়াছে, কেন না, ষোড়শী নব-শিক্ষিতা অবিবাহিতা সুন্দরী তরুণীর যদি ভাবনা না থাকে তবে জগতে ভাবনা কাহার? ক্ষণিকের জন্য মনে পড়িল নিজের প্রথম যৌবনের কথা,

তখন সংসারের ভাবনা, খাইবার পরিবার ভাবনা ছিল না বটে, কিন্তু বিশ্বের সকল বেদনায় অন্তর আকুল হইত, জগতের সমস্ত ভাবনা যেন আমার ভাবনা; শুধু বাস্তব জগতের নয়, অবাস্তব উপন্যাস-জগতেব বিরহী-বিরহিণীদের ব্যথাও যে আমার ব্যথা।

ধীরে বলিলাম, কি ভেবেছিস সারারাত জেগে ?

টেবিল সাজানো শেষ করিয়া আলমারীতে কি নতুন বই আসিয়াছে তাহা দেখিতে দেখিতে বেণু বলিল, বলছি, তুমি খেয়ে নাও না।

খাওয়া শেষ করিয়া ডাকিলাম, বিনি, কাছে আয়।

বেণু ধীরে আসিয়া দেওয়ালের পাশে চেয়ারটায় বসিল। বলিলাম, কি, সব খুলে বল।

ভীত-স্বরে বলিল, একখানা চিঠি আছে।

এই তাহাকে জীবনে প্রথম সত্য সত্যই ভীত হইতে দেখিলাম, তাহার এ রূপ আমার একেবারে অপরিচিত।

আমি ত একটু ভয় পাইয়া বলিলাম, চিঠি ? কার—আমার ?

মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, না, আমার চিঠি।

গম্ভীরস্বরে বলিলাম, কে লিখেছে ?

তাহার সহিত কখনও গম্ভীরস্বরে কথা বলি নাই, বড় অস্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল।

সে ধীরে বলিল, একটা ছেলে।

বারুদস্তূপে যেন আগুন পড়িল, ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, ছেলে ? কে সে ছেলে ?

আমার এ ক্রুদ্ধমূর্ত্তি জীবনে সে কখনও দেখে নাই। তবু বিচলিত হইল না, ধীরে বলিল, যে ছেলেটি তোমার কাছে প্রায়ই আসে, তোমাব কলেজের।

আপনাকে দমন করিয়া বলিলাম, দেখি চিঠিখানা।

ধীরে আঁচল হইতে একখানি নীল খাম বাহির করিয়া দিল, তার পর স্তব্ধ হইয়া র‍্যাকে সাজানো নভেলগুলির দিকে প্রদীপ্ত নয়নে তাকাইয়া রহিল।

চিঠিখানি খুলিলাম, আইভরি-ফিনিস কাগজে বড় বড় হাতের লেখা, তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেলাম, রাগের ঝোঁকে সমস্ত কথা ঠিক বুঝিলাম না, শুধু ছেলেটির নামের সই বার বার দেখিলাম। মোটামুটি বোঝা গেল এ হচ্ছে যুবকটির প্রেমপত্র এবং এও বেশ বোঝা গেল যে, এ তাহার প্রথম প্রেমপত্র নয়, বরং শেষ প্রেমপত্র বলা যাইতে পারে, কেন না রঙ্গীন কল্পনার পাল উড়াইয়া প্রেমস্বপ্নের প্রখরস্রোতে বহুক্ষণ উজানে বহিয়া পত্রটি কিছু বস্তুলাভের আশায় বিবাহ প্রস্তাবের ঘাটে আসিয়া ঠেকিয়াছে। বেণুর দিকে ভীত নয়নে তাকাইলাম। চক্ষু দিয়া কি প্রখর অগ্নিদীপ্তি ক্ষরিতেছে, সেই আগুনের স্পর্শে আমার মস্তিষ্কে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হইল। ছোটবেলা হইতে বেণুর চোখের চাউনি দেখিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিয়া আসিতেছি, আজও ভুল বুঝিলাম না।

গম্ভীর ভাবে ডাকিলাম, বেণু—

সে ধীরে উত্তর দিল, কি—

জিজ্ঞাসা করিলাম, কতদিন চিঠি লেখা-লেখি হচ্ছে ?

সে বলিল, প্রায় এক মাস।

কঠোর কিছু বলিতে যাইতেছিলাম, দেখিলাম, তাহার মুখ লজ্জায় সিঁদুরের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, দাঁড়াইতে না পারিয়া সে বসিয়া পড়িল। তাহাব মুক্ত কালো কেশের ঠিক উপরে বইয়েব র‍্যাকে লাল ভেলভেট্ কাফে মোড়া সেক্‌স্‌পিয়র সোনার জলের তর্জ্জনী তুলিয়া বলিলেন, সাবধান। তাহার একপাশে নীল সিল্কেব কাপডে বাঁধানো কালিদাস যেন হঠাৎ কত শতাব্দীব নিদ্রা হইতে জাগিয়া বলিলেন, উজ্জয়িনীর কাব প্রেমেব কোন অপমান সহিবে না। তাহাব আব-এক পাশে ফ্রেঞ্চ মরক্কো মোড়া টুর্গেনিভ র‍্যাক্ কাঁপাইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিশোরীব প্রেম বিশ্ববিধাতাব অপূর্ব্ব পবিত্র আবির্ভাব, তাহাকে প্রণাম কর। তাবপব ঘবেব চারিদিকে এদেশেব ও বিদেশের, এ যুগের ও প্রাচীন যুগেব কত কবি ঔপন্যাসিক এই প্রথম-প্রেমভীতা হর্ষাশঙ্কাকম্পিতা বেণুকে সমর্থন করিবার জন্য বসন্তেব দক্ষিণ-সমীরেব মত মর্ম্মধ্বনি করিয়া উঠিলেন। যেন কত শত শতাব্দীর কত বিচিত্র প্রাণস্রোত প্রেমধারা এই ক্ষুদ্র গৃহে বদ্ধ স্তব্ধ হইয়াছিল, আজ সহসা আনন্দকল্লোলধ্বনি করিল কত বিচিত্র যুগের বিচিত্র দেশের কত কুহু ও কেকা এই মূক গ্রন্থনীড়গুলির শুষ্কপত্রদলের ভিতর নিদ্রিত ছিল, কিশোরী-প্রেমের স্বর্ণকাটির স্পর্শে সকলে জাগিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল,—প্রেম চিরসুন্দর চিরজয়ী চিরপবিত্র বলিয়া জগতের সৌন্দর্য্যস্রোত আনন্দময় সৃষ্টিধারা চিরপ্রবাহমান। মেজেতে

বসরার কার্পেটের ফুল ও পাখীগুলি সজীব হইয়া গাহিয়া উঠিল। হার মানিলাম।

ধীরে বেণুকে বলিলাম, আচ্ছা এখন যাও, বিকালে পরামর্শ করা যাবে।

মৃদু হাসিয়া সে ধীরে চলিয়া গেল, বুঝিল তাহার জয় হইয়াছে।

পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া আবাব সিঁড়ি হইতে তাহার দুই হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আনিলাম, জোর করিয়া সোফায় বসাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন প্রার্থনার সুবে বলিলাম, বিনি, সত্যি বল, খুব ভালবেসেছিস ?

তাহার সমস্ত মুখ রাঙা গোলাপ হইয়া উঠিল, মুখ নত করিল। আবেগের সহিত বলিলাম, বল, সত্যি বল।

হতবাক্ সে বসিয়া রহিল, তাবপব শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া হাত ছাড়াইয়া দৌড়াইয়া পলাইল।

ভাবিয়াছিলাম, বলিব না। কিন্তু বেণুর জন্য বলিতে হইল। এ নজীর না দেখাইলে কেবলমাত্র যুক্তিতর্ক কবিয়া বেণুব কেসে জয়ী হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ বেণুর বাবা সুরেশ নামক কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় যন্ত্রে ফার্ষ্ট'ক্লাশ মার্কামারা আশ্চর্য্যকর বস্তুটির দিকে যেরূপ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

কিন্তু বলিব কি করিয়া? ব্রীড়াবনতা নববধূর মত সে-গোপন প্রেমরহস্তকে কেমন করিয়া অবগুণ্ঠনমুক্ত করিব ? আমার বয়স চল্লিশ হইতে পারে, কিন্তু সে-প্রেম যে চিরতরুণী নববধূ। বলিতে পারি এমন সাহস আমার নাই, সুতরাং লিখিতে হইল।

ভূটিয়াবংশাবতংসকে দিয়া কলেজে লিখিয়া পাঠাইলাম, বিশেষ কাজের জন্য কলেজে যাইতে পারিলাম না। যাক্, বেণুর আনন্দের আশায় আমার ছাত্রেরা একটু আনন্দ করুক। তবে তাহাদের যে সহপাঠীর জন্য আমার এ দুরবস্থা তাহাকে ছুটি দেওয়া হইবে না, তাহার নামে এক কড়া চিঠি পাঠাইলাম, যেন সে সন্ধ্যায় নিশ্চয় আসে। আমার পুস্তকগুলির উপর হঠাৎ তাহার পরমা ভক্তির উদয়ের কারণটা জানা গেল। আজ সমস্ত দিন আমি লিখিয়া মরিব কেন, সেও ভাবিয়া মরুক্। দুয়ার বন্ধ করিয়া যৌবনের পূর্ব্বকথা লিখিতে বসিলাম।

কলেজের সকল ছেলেদের মধ্যে সুরেনের সঙ্গে আমার মুখের ভাব খুব না থাকিলেও মনের ভাব কেমন জমিয়া উঠিতেছিল। আমাদের মধ্যে কেবল অবস্থাগত প্রভেদ নয়, স্বভাবগত প্রভেদ যথেষ্ট ছিল। সে ছিল ধনী ব্যবসাদারের ছেলে, আর আর আমি গরীব স্কুলমাষ্টারের; সে থাকিত প্রকাণ্ড প্রাসাদে ইলেকট্রিক আলোশোভিত গৃহে, আর আমি থাকিতাম মেসের ভাঙ্গা তক্তায়, ভাঙ্গা টিনের বাক্সের ওপর কেরোসিনের আলো জ্বালাইয়া। সে ছিল অতি সৌখীন, ফিতে-ওয়ালা জুতা ব্যবহার করিতে, কোট, সার্ট বা মিলের ধুতি পরিতে তাহাকে কোন দিন দেখি নাই; জুতা-জামা সম্বন্ধে আক্তি-বিচার করা আমার মত ছিল না, থাকিলেও সামর্থ্যে

ঝুলাইত না। আমাদের মধ্যে শুধু এক বিষয়ে সামঞ্জস্য ছিল আমরা দু'জনেই কলেজে খুব দেরী করিয়া যাইতাম, ক্লাসের শেষ বেঞ্চে এক কোণে বসিতাম, আর দু'জনেই নোট না টুকিয়া বা অধ্যাপকের কোন কথা না শুনিয়া নিবিষ্টমনে ইংরেজী নভেল পড়িতাম। এখানেও কিন্তু আমাদের মধ্যে একটু ভেদ ছিল। আমি পড়িতাম, যাঁহারা জীবনের উদার রাজপথে সাহিত্যসুধার ভাণ্ড হাতে করিয়া অমৃতরস চিরদিনের জন্য দান করিয়া দিয়া গিয়াছেন, যেমন, ব্যাল্‌জাক্‌, ডিকেন্স, টলষ্টয়। আর সুরেন পড়িত, যাঁহারা প্রাণের নির্ম্মল পথ ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণ বক্র গলিতে মদের বোতল হাতে করিয়া একটুকু সাহিত্যরসের সহিত প্রচুর কামরস মিশাইয়া জিনিষটা উগ্রতীব্র করিয়া অতি সস্তাদরে বেচিয়া গিয়াছেন, যেমন, রেনল্ডস, ভিক্টোরিয়া ক্রস্‌। তবু দুইজনের মধ্যে ধীরে ধীরে কেমন আশ্চর্য্য মিলন হইতে লাগিল। প্রেমের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা আমাকে মুগ্ধ করিত, প্রেমের স্থূলরূপে সে মোহিত হইত। তাই প্রেমের সত্য প্রকৃতি লইয়া আমাদের মধ্যে আলোচনা, তর্ক উঠিত।

সেদিন আমার বেশ মনে আছে, নভেলে মনটা কেমন বসিতেছিল না, ইংরাজী অধ্যাপক শেলীর কি একটা পদ্য পড়াইতেছিলেন। এই মাংসবহুল বিদ্যাগর্ব্বিত ইংরেজপুঙ্গবের অদ্ভুত সাহিত্যরসজ্ঞান ও অত্যাশ্চর্য্যকর ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল, শেলী কি সত্যসত্যই ইহার স্বদেশবাসী ছিলেন? দেখিলাম, সুরেনেরও নভেলে মন নাই, কিন্তু তাহার অন্যমনস্কতাটা অন্যরকমের। সে যে ক্লাসে বসিয়া

আছে এ বিষয়েও সে হতজ্ঞান। নীল আকাশে কয়েকটি পায়রা উড়িয়া বেড়াইতেছিল তাহাই সে দেখিতেছে। আমার নভেলের নায়ক লর্ডের দুলাল তখন কোন কুটীরবাসিনীর প্রেমে পড়িয়াছেন। তারপর লেখক প্রেমিকের বর্ণনা করিতেছেন। সেগুলি পড়িতে পড়িতে সহসা মনে হইল, হয়ত সুরেন কাহারও প্রেমে পড়িয়াছে। প্রেমের লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলাম, কয়েকটি মিলিয়া গেল, কেমন সন্দেহ হইল, ঠিক কবিলাম সুরেনেব বিষয় সন্ধান লইতে হইবে।

এক প্রফেসারের অসুখের জন্য সেদিন সকাল সকাল ছুটি হইয়া গেল। ছুটির পর সুরেনেব অলক্ষ্যে তাহার পিছন পিছন চলিলাম। কয়েকটি বড় বাস্তার মোড় পার হইয়া সে এক গলির ভিতব ঢুকিল; গলির পর গলি, তাহার ভিতর গলি, অবশেষে এক ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গলিতে আসিয়া থামিল; গলিটি যেমন বক্র তেমনি দুর্গন্ধময়। এক আঁস্তাকুড়ের পাশে আসিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সামনের বাড়ীর দোতালার দিকে তাকাইয়া রহিল। কাহাকে সে দেখিতেছে দেখিতে পাইলাম না; শুধু বুঝিলাম, দোতালার জানালা খোলা, কোন সুন্দরী নিশ্চয় বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে জানালা বন্ধ হইয়া গেল, তবু সুরেন নড়িল না, গন্ধবাসিত নীল সিল্কের রুমালটা পকেট হইতে বাহির করিয়া নাড়িতে লাগিল। জানালা বন্ধ হইয়াছে কিন্তু তাহার একটি পাখি যে উঠিয়াছে তাহা আগে লক্ষ্য করি নাই, জানালার গায়ে শাড়ীর লাল পাড় দেখিয়া বুঝিলাম, এবার মেয়েটির দেখার পালা।

আবার জান্‌লা খুলিল! সুরেন কয়েকবার গলির এক মোড় হইতে আর মোড় পর্য্যন্ত পদচারণ করিল, তারপর ধীরে ধীরে উদাসভাবে চলিয়া গেল।

আমি লুকানো জায়গা হইতে বাহির হইলাম, ধীরে অগ্রসর হইয়া কম্পিত পদে আঁস্তাকুড়ের নিকট দাঁড়াইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সম্মুখের জানালায় এক কিশোরী কতকগুলি ছেঁড়া সার্ট কাপড় সেলাই করিতেছে। তাহার আলুলায়িত কেশ জানালার গরাদ পার হইয়া বিবর্ণ দেওয়ালে ঝিকিমিকি করিতেছে, চাঁপারঙের শাড়ী গায়ের রঙের সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছে। গৃহকর্ম্মরতা কিশোরীর মঙ্গলআনন্দশ্রী কতক্ষণ দেখিয়াছিলাম জানি না, সহসা এক তীব্র কটাক্ষে চোখ ধাঁধিয়া জগৎ যেন পুড়িয়া গেল, তারপর সশব্দে জানালা বন্ধ হইল, কিন্তু কোন পাখি উঠিল না।

দাঁড়াইয়া রহিলাম,—একবার জানালা খোলার শব্দ, আবার এক বহ্নিশিখাময় কটাক্ষ, আবার সশব্দে জানালা বন্ধ।

তবুও দাঁড়াইয়া রহিলাম,—বহুক্ষণ পরে একবার একটি পাখি উঠিয়া তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেল, আর জানালা খুলিল না।

গড়ের মাঠ ঘুরিয়া অনেক রাতে যখন মেসে ফিরিলাম, তখন সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

সে রাতে আর ঘুম আসিল না। ভাবিতে লাগিলাম, কোথায় একে দেখিয়াছি, কোথায় ওই চোখ দুইটির অমনি অনলভরা দীপ্ত চাউনি দেখিয়াছি।

গির্জ্জার ঘড়িতে রাত একটা বাজিয়া গেল, শুক্লা একাদশীর

জ্যোৎস্নায় বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল। মনে পড়িল, তখন থার্ড ক্লাসে পড়ি। জেলার স্কুলের ছুটির পর বাড়ী ফিরিতেছি, দেখিলাম, পথের এক কোণে একদল ছেলে গোল হইয়া জমিয়াছে। আমি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিলাম, সহসা দেখি, সম্মুখের বাড়ী হইতে একটি সাত বছরের মেয়ে প্রদীপ্তমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য দাঁড়াইলাম।

মেয়েটি বিজয়িনীর মত আসিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, আমার পায়রা কোথায়? দাও।

দেখিলাম, একটি সাদা পায়রা একখানি ডানা ভাঙ্গিয়া এতক্ষণ ধুলায় লুটাপুটি করিতেছিল; কয়েকটি ছেলে ঢিল ছুড়িয়া পেন্সিলের খোঁচা দিয়া তাহার ভবযন্ত্রণা শীঘ্র শীঘ্র দুর করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিল। মেয়েটিকে এমন ক্ষিপ্তভাবে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া সকলে সরিয়া গেল, কেবল একটি ছেলে পায়রাটিকে পথ হইতে নিষ্ঠুর আনন্দের সহিত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, ভারি পায়রা নিতে এসেছেন, আমি পায়রা পথ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি, দেব না। ছেলেটি এতক্ষণ পায়রার মাংসে কিরূপ সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য করা যাইতে পারে তাহার বর্ণনা করিয়া ছেলেদের মুগ্ধ করিতেছিল।

মেয়েটি দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, দাও বলছি, নইলে ভাল হবে না।

সেইদিন তাহার চক্ষে এই তীব্র অগ্নিময় কটাক্ষ দেখিয়াছিলাম।

ছেলেটি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল। আমাদের ক্লাসে সে সবচেয়ে দুর্দান্ত ছেলে, স্কুলে গুণ্ডামির জন্য প্রসিদ্ধ। ইচ্ছা থাকিলেও তাহার নিকট হইতে পায়রা উদ্ধার করিতে কেহ সাহসী হইল না।

রাগে আমার গা রি-রি করিয়া উঠিল। ক্লাসে আমাকে সকলে ভালো ছেলে, অতি শান্তশিষ্ট বলিয়া জানিত, কিন্তু জানিত না যে রাগিলে আমার কোন জ্ঞান থাকে না।

অগ্রসর হইয়া আমি বলিলাম, এই শূয়ার, শীগ্‌গীর পায়রা ফিরিয়ে দে!

আমার গর্জ্জনে সকলে চমকিয়া উঠিল, একটু ভীত হইয়া ছেলেটি উত্তর দিল, ভারি আবদার দেখাচ্ছেন, জোর ফলাতে এসেছেন—দেব না, কি করবি, কি কববি?

গর্জ্জন করিয়া উঠিলাম, তবে রে!

নিমেষের মধ্যে বইগুলি পথে ছুড়িয়া ফেলিয়া ছেলেটির মুখে এক ঘুসি মারিয়া দুই হাতের নখ দিযা তাহার গাল গলা আঁচড়াইয়া ছিঁড়িতে লাগিলাম, পায়রা ফেলিয়া দিয়া সে আমার সহিত মল্লযুদ্ধে লাগিয়া গেল। মেয়েটি সযত্নে আহত পায়রাটিকে তুলিয়া লইয়া পথের একপাশে দাঁড়াইয়া আমাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ধূলায় ধস্তাধস্তির পর কয়েকটি ছেলে মিলিয়া আমাদের ছাড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু আমি বলিতে পারি, সেদিন আমি তাহাকে হারাইতাম, নয় মরিতাম।

তারপর মনে পড়িল, প্রতিদিন স্কুলে যাইবার আসিবার সময় কয়েক মুহূর্ত্ত এই বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইতাম, যদি এ

বালিকার দেখা পাই। যাইবার সময় কোনদিন দেখা পাইতাম, কোনদিন পাইতাম না; আসিবার পথে বিকেলে প্রায়ই সে দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া থাকিত।

ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া ভাব হইল; জলছবি, রঙিন মার্ব্বেল, লজনচুষ ইত্যাদি নানা দ্রব্য উপহার দিতাম। প্রথম প্রথম সে কিছুতেই লইতে চাহিত না। তারপর সে লোভে পড়িয়া লইত, না ভালবাসিয়া লইত, এ সমস্যার সমাধান আমি কোনদিন করিতে চাহি নাই।

হঠাৎ দুই মাস পরে তাহারা সহর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তখন বঙ্কিমচন্দ্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রতাপের মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এ বালিকাকে আজীবন ভালবাসিব।

মেসের ছাদে চাঁদের আলোয় ধীরে ধীরে এত কথা মনে পড়িল। বাস্তব ঘটনাময় জীবন-নাট্যের আড়ালে কোন্ শিল্পী মানসলোকে সবার অগোচরে তুলির পর তুলি বুলাইয়া কি যে আঁকে তাহার সন্ধান কেহই পায় না; হঠাৎ কোনদিন পর্দ্দা উড়িয়া যায়, আশ্চর্য্য সৃষ্টিকার্য্য বাহির হইয়া পড়ে। সেই সুমধুর বালিকা-স্মৃতিটি এ কি নয়নভুলানো কিশোরী-শ্রীরূপে পাইলাম।

পরদিন হইতে দুইজনেরই চঞ্চলচিত্ত ইংরেজী নভেলের রাজ্য হইতে বারবার পলাইয়া এক সরু গলির পুরানো বালিখসা বাড়ীর চারিদিকে রাঙা আঁচল ওড়ার ছন্দে কালো চুল ওড়ার তালে বারে বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল কলেজে আসিতে সুরেনের প্রায়ই দেরী হইত, শেষের ঘণ্টা সে কিছুতেই

থাকিত না। মাঝে মাঝে আমিও কলেজ পলাইয়া তাহার পিছন পিছন যাইতে সুরু করিলাম। কিন্তু সুরেনের প্রতি প্রেমের ঝড় যতই শুদ্ধ হইয়া মেয়েটির অন্তরের কোণে কোণে জমিতে লাগিল, আমার প্রতি প্রীতির পারাটা ততই ডিগ্রির পর ডিগ্রি নামিতে লাগিল। অভ্যর্থনা গুরুতর হইতে আরম্ভ হইল। সুরেনের ভাগ্যে একদিন পান জুটিল আর আমার ভাগ্যে পান-ধোওয়া জল; এবার সুরেনের উপর ফুলের মালা পড়িবে, আর আমার উপর সম্মার্জ্জনীবৃষ্টি আরম্ভ হইবে ভাবিয়া গলিতে যাওয়া ছাড়িয়া দিলাম, অর্থাৎ গলির রঙ্গমঞ্চে প্রেমের মূকদৃশ্যনাট্যে সুরেনের অভিনয়টা যবনিকার অন্তরাল হইতে দর্শক হিসাবে মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতাম—রঙ্গভূমিতে অভিনেতা হইবার দুঃসাহস দূর হইল।

কলেজে দুইজনেরই নভেল পড়া বন্ধ হইল দেখিয়া পরস্পরে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দেখিলাম, জীবনে যখন নভেল সুরু হয়, তখন নভেল পড়া আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। আমি থাকিতাম প্রেমের মদিরার ঘোরে, রৌদ্রসিক্ত কর্ম্মহীন সুদীর্ঘ দিন ও জ্যোৎস্নাতপ্ত মদিরাময় বিনিদ্র রাত্রির রঙীন পাত্র যৌবনের ফেনিল উচ্ছ্বাসে বিরহের স্বপ্নসুধায় ভরিয়া তুলিতাম। কিন্তু সুরেনের কাছে প্রেম অগ্নিশিখার মত, তাহার তীব্রতেজে সে দিন দিন দগ্ধ হইতেছিল, চক্ষে কি বুভুক্ষু দৃষ্টি, মুখে কি তৃষিত ভাব, সমস্ত দেহে যেন ক্ষুধার জ্বালা!

সন্ধান লইয়া জানিলাম, মেয়েটি অবিবাহিতা। বিবাহ হইবার মত বয়স অনেক দিন হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাব। আরও

জানিলাম, জাতিতে তাহারা কায়স্থ। এবার সমাজ আমার দুরাশা দূর করিল, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। সুরেন যে কায়স্থ এইটুকুই আশার কথা।

কেবল মূক অভিনয়ে, কয়েক মিনিট দেখায় গলির নাট্য ভালো জমিতেছিল না, বাক্‌দেবীর আবির্ভাব হইলে প্রজাপতির আগমন সুনিশ্চিত। কিন্তু তাহারা যে সাহস করিয়া কথাবার্ত্তা কহিবে এমন লক্ষণ দেখিলাম না।

অনেক ভাবিয়া ঠিক করিলাম, সুরেনের নাম করিয়া মেয়েটিকে একখানি চিঠি লিখি, এবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করা যাক। এক পাতার একখানা চিঠি লিখিতে আমার একটি রাত ও এক ডজন চিঠির কাগজ নষ্ট হইয়াছিল। কম্পিতপদে দোদুল্যমান অন্তরে বিস্কুটের টিনের চিঠির বাক্সে পত্রখানি রাখিয়া আসিলাম।

ইহার পরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

বুঝিলাম কথাবার্ত্তাটা পুরুষের দিক হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত। সুরেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা অনেকদিন প্রায় বন্ধ ছিল, একদিন তাহাকে কমনরুমের এক নিভৃত কোণে ধরিয়া লইয়া গিয়া ইচ্ছা করিয়া বিবাহে প্রেমের প্রয়োজন সম্বন্ধে তর্ক তুলিলাম। নানা চতুর প্রশ্ন করিয়া নানারূপে তাহার মনের অবস্থা জানিয়া এইটুকু বোঝা গেল, সে মেয়েটিকে বিবাহ করিতে রাজী। কিন্তু তাহার সমস্যা এই, মেয়ের বাপের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলে পিতা কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইবেন বলিয়া প্রস্তাবে রাজী হইবেন, মেয়েও পিতার ভার দূর করিবার জন্য আপত্তি

করিবে না, কিন্তু সত্যসত্যই মেয়েটি তাহাকে ভালবাসে কি না কিরূপে জানা যাইবে ?

অকূলে কূল মিলিল। মেয়েলি ছাঁদে মোটা মোটা অক্ষরে এক চিঠি লিখিয়া সুরেনের নামে পাঠাইলাম। কি লিখিয়াছিলাম সব মনে নাই। মেয়েটি যেন লিখিতেছে, সে সুরেনকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তাহাকে না পাইলে সমাজে সে আজীবন কুমারীব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবে।

এক ফাল্গুন-জ্যোৎস্নাময় শুভরাত্রে সুরেনের সহিত শান্তির বিবাহ হইয়া গেল।

আমাকে যে সুরেন সে-বিবাহে নিমন্ত্রণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহার জন্য আমি তাহাকে দোষ দিই না। সে রাতে আমিও খুব উৎসব করিয়াছিলাম। আমার ছয়মাসের টিউসানির জমানো সব টাকা নিঃশেষিত করিয়া সমস্ত বন্ধুদের ডাকিয়া অকারণে বিপুল ভোজ দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর সাত রাত ঘুম হয় নাই।

গলিতে শান্তির দেখা পাইবার কোনপ্রকার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বিবাহের পর সুরেনের প্রকাণ্ড প্রাসাদে সে কোথায় হারাইয়া গেল। কতদিন সেই পথের ধারে লুকাইয়া ঘুরিয়াছি। চারতলার কোন্ ঘরে সে আছে, কে জানে? মাঝে মাঝে সুরেনকে তাহার দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত প্রশ্ন করিতাম যে, সে বিস্মিত হইত, আমিও লজ্জিত হইতাম। প্রশ্ন করা ছাড়িয়া দিলাম।

তারপর পরীক্ষার পড়া আসিল; দুই বৎসরের পাপ দুই মাসে

প্রায়শ্চিত্ত করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলাম। পাশের পর এক জেলা-কলেজে চাকুরি লইয়া চলিয়া গেলাম।

কয়েক বছর পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। সুরেনের সন্ধানে তাহাদের বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া দেখি, গেটে এক ভোজপুরী দরোয়ান বসিয়া আছে, উপরের বারান্দায় কতকগুলি ময়লা চিক চট কদর্য্য কাপড় ঝুলিতেছে, দেখিলেই বলিয়া দেওয়া যায় এ এক মাড়োয়ারীর বাড়ী। পাড়ার লোকদের নিকট জানা গেল, বছর দেড়েক আগে সুরেনের বাবা ব্যবসায়ে ফেল হইয়া হঠাৎ মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয়সম্পত্তি টাকার থলি সব দেনার ছিদ্র দিয়া পাওনাদারদের হাতে খসিয়া পড়িয়াছে, সুরেন কিছুই ধরিয়া রাখিতে পারে নাই

বহু চেষ্টা করিয়া সুরেনের বাড়ীর সন্ধান পাইলাম—এক গলির ভিতর ছোট ভাঙা বাড়ী। একদিন বিকালে সেখানে হাজির হইয়া সুরেনকে ডাকিব ভাবিতেছি, খুব ঝগড়ার শব্দ শোনা গেল। বাহিরের ঘরে কথা-কাটাকাটি হইতেছে, বাড়ীওয়ালার লোক শাসাইতেছে, আগামী মাসে উঠাইয়া দিবে; সুরেন রাগিয়া বলিতেছে, মোটে ত তিনমাস বাড়ীভাড়া বাকী আছে, আগামী মাসে একটি চাকুরি পাইলে সব চুকাইয়া দিবে। সহসা মুখ তুলিয়া চাহিতেই চোখে পড়িল দোতলার জানালায় অশ্রুসিক্ত নয়নে কে দাঁড়াইয়া—সে এত কাঁদিতেছিল যে, আমি যে তাহার দিকে চাহিয়া আছি তাহা সে দেখিতে পাইল না। সেই দারিদ্র্যক্লিষ্টা অশ্রুময়ী ক্ষীণা তনুলতার দিকে চাহিয়া আর

দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, কান্না চাপিয়া গলি হইতে ছুটিয়া বাহির হইলাম।

সারারাত বিছানায় ছট্‌ফট্ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করিতে পারি এদের জন্য, আমি কি করিতে পারি? এদের সুখের সংসার আমি বাঁধিয়া দিয়াছিলাম, আজ দুঃখের দিনে এদের ভার লাঘব করা যে আমার কর্ত্তব্য। কত অদ্ভুত প্ল্যান মাথায় আসিতে লাগিল। একবার ভাবিলাম আমার কয়েক বছরের জমানো কয়েক হাজার টাকা কোন কাল্পনিক মৃত আত্মীয়ের সম্পত্তি বলিয়া কোন উকীলের সাহায্যে পাঠাইয়া দি—তাহাদের বংশের কোন দুঃসাহসিক পিতৃতাড়িত যুবক কি রেঙ্গুন বা হনলুলু বা মেসোপোটেমিয়ায় গিয়া কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া মরিয়া যাইতে পারে না? আবার ভাবিলাম, সোজাসুজি যাইয়া তাহাদের অর্থ সাহায্য করি, কিন্তু সে সাহায্য তাহারা গ্রহণ নাও করিতে পারে। বেনামীতে মনিঅর্ডারে যদি টাকা পাঠাই, সে টাকা ফেরৎ আসিতে পারে।

পরদিন কয়েকখানি নোট চিঠির খামে পূরিয়া তাহাদের টিনের ডাকবাক্সে লুকাইয়া দিয়া আসিলাম। টাকা দিলাম বটে কিন্তু দেখা করিবার পথ একেবারে বন্ধ হইল। দেখা করিতে খুব বেশী ইচ্ছা ছিল না, শুধু দরজার গোড়ায় ময়লা-ফ্রক-পড়া খুকীটিকে দেখিয়া একটু আদর করিবার বড় লোভ হইয়াছিল, তাহাও সংবরণ করিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

একবার টাকা রাখিয়া ফিরিতেছি, দেখি, সুরেশের ঠিক পাশের বাড়ীর দেওয়ালে একখানি কাগজ মারা রহিয়াছে—

বাড়াখানি ভাড়া দেওয়া যাইবে। আনন্দে অন্তর নাচিয়া উঠিল। পাশাপাশি থাকিলে এ পরিবারের দুঃখ কষ্ট অভাব সব ঠিক জানিতে পারিব, প্রতিবেশী বলিয়া ভাব করিয়া সাহায্যও করিতে পারিব। কিন্তু রাত্রে বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বুঝিলাম, এত কাছাকাছি যাওয়া হয়ত ভাল হইবে না। গির্জ্জার ঘড়িতে রাত তিনটা বাজিল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, না, ও বাড়ী ভাড়া লইব না। তখন ঘুম আসিল। জীবনে এত বড় প্রলোভন আমি বোধহয় কখনও জয় করি নাই। বাড়ী যদি বেশীদিন খালি পড়িয়া থাকিত, কি হইত বলিতে পারি না, দিন সাতেকের মধ্যে এক ভাড়াটে আসাতে আমি বাঁচিয়া গেলাম।

টাকা দিয়া অন্তরে তৃপ্তি হইত না। দেখিতাম খুকী ছেঁড়া পাৎলা ময়লা জামা গায়ে দিয়া ঘুরিতেছে, শীতের দিনে একটা গরম জামাও গায়ে নাই। সন্ধ্যাবেলায় খুকীকে কোলে করিয়া আমার বাড়ীর কাছ দিয়া ঝি প্রায়ই কোথায় যাইত। ধূমমলিন শীতসন্ধ্যায় এই ভ্রমণটায় আসলে ঝি বন্ধুবান্ধবদের সহিত গল্প করিতে বাহির হইত, বিনা কাজে বাড়ী হইতে বাহির হইতে দিবে না বলিয়া পাৎলা-জামা-পরা খুকীকে উপলক্ষ্যরূপে টানিয়া আনিত। প্রতিদিন পথের দেখায় আলাপ সুরু করিয়া দিলাম। পুতুল লজনচুষ রঙীন বল ইত্যাদি নানা সৈন্যের সাহায্যে তাহার ছোট হৃদয়রাজ্য জয় করিয়া লইলাম; একদিন খুকী ও তাহার ঝিকে ধরিয়া আমার বাড়ীতে আনিলাম। একটি গরম লাল ফ্রক খুকীর গায়ে

পরাইয়া বলিলাম, দেখ ত ঝি বেশ মানিয়েছে না, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে! খুকী নূতন জামা পরিয়া সরল হাসিয়া অস্ফুট আনন্দধ্বনি করিতে করিতে নাচিতে লাগিল, আমার কোলে চড়িতে কোন আপত্তি করিল না, চুল টানিয়া স্ব-ইচ্ছায় একটি চুম্বনও দিল। কিন্তু খুকীর কাছে ঝির ব্যবহার আশাপ্রদ হইল না, সে ফ্রক লইতে নানা আপত্তি তুলিতে লাগিল। আমি তাহাকে বুঝাইতে লাগিলাম, ফ্রকটি আমি একজন ভাগ্নীর জন্য কিনিয়াছিলাম, তাহার গায়ে ছোট হইল, অথচ দোকানদার কিছুতেই ফেরৎ লইবে না, কেন জামাটা মিছামিছি পোকায় কাটিবে। অবশ্য ভাগ্নীটি কাল্পনিক। আরও বলিলাম, খুকীর বাবার সঙ্গে আমার যথেষ্ট ভাব আছে, আমরা একসঙ্গে পড়িয়াছিলাম, তাঁহার বাড়ীতে আমি প্রায়ই যাই। কিন্তু ঝি কিছুতেই লইতে চায় না। তখন ঝিএর এই মূর্খের মত লজ্জাজনক ব্যবহার দেখিয়া খুকী দুর্ব্বলের বল ও যুক্তি ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। অগত্যা খুকীর গা হইতে জামা খোলা হইল না, ঝি বলিয়া গেল, কাল সে ফিরাইয়া দিয়া যাইবে।

শুধু জামা গেল না, তাহার সহিত মোজা, টুপি, গরম গেঞ্জি ও খেল্‌নাও গেল, প্রতিবস্তুটির উপর খুকীর সমান আকর্ষণ, পক্ষপাতিত্বের দোষ তাহাকে মোটেই দেওয়া যাইতে পারে না, সব জিনিষগুলিই তাহার চাই, প্রত্যেক জিনিষ সরাইয়াই দেখা গেল, ক্রন্দনের সুর সপ্তমে উঠে। অবশ্য সব জিনিষই সেই কল্পিত ভাগ্নীর জন্য কেনা হইয়াছিল, সে আনন্দচিত্তে খুকীকে সব দান করিল।

রাত্রে কিন্তু বিছানায় শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে ভয় হইল—সে ভয়, ধরা পড়িবার ভয়। খুকীর আনন্দে এ কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। খুব ভোরবেলা উঠিয়া বাড়ীতে তালা লাগাইয়া "টু লেট" লট্‌কাইয়া পালাইলাম। দু'এক দিনের মধ্যেই বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইল।

চাক্‌রীর সন্ধানে ঘুরিতে হইল। সুরেন নিজের উদ্যোগে চাক্‌রী জুটাইতে পারিবে এ ভরসা আমার ছিল না, অতি কষ্টে অতি সামান্য মাহিনার এক চাক্‌রী জুটাইয়াছিল। বেশী টাকার মাহিনার এক চাক্‌রীর সন্ধান পাইলাম। আফিসের দরওয়ান, বড় বাবু ও বড়-সাহেবকে বহু খোসামোদ করিয়া বেনামী চিঠি লিখিয়া সুরেনকে চাক্‌রিটি জুটাইয়া দিলাম।

আমি পশ্চিমে এক কলেজে প্রফেসারি লওয়াতে তাহাদের সহিত আবার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

পাঁচ বছর পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। এই হৃদয়হীনা নগরসুন্দরীর কি আকর্ষণশক্তি আছে জানি না—ইহার প্রমত্ত রথস্রোত, বিপুল জনতা, চঞ্চল জন-কোলাহল, ইহার মোটর-ট্রাম-ঘর্ঘর-মুখর পিচেমোড়া কালো পথ, বক্র সঙ্কীর্ণ গলি, ইহার প্রাসাদরাশি, কদর্য্য বস্তি, ইহার ধূম-ধূলি শব্দ জনপ্রবাহ সব মিলিয়া আমাকে টানিয়া আনে,—মানবের কর্ম্ম ও চিন্তা, প্রমত্ত শক্তি ও বিপুল লোভের নানা রঙের নানা প্রখর স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে অহর্নিশি উন্মত্ত জীবনের ফেনিলতায় চিত্ত মথিত হইয়া উঠে।

এইরকম এক শীতের প্রভাতে মধুর রৌদ্রে আবিষ্ট হইয়া

ভাবিতেছিলাম, সুরেনকে কি করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিব। একটি চাকরের সহিত একটি ছোট মেয়ে নিমন্ত্রণপত্র লইয়া আসিল। পাড়ায় যে নূতন বাড়ী তৈরী শেষ হইয়াছে, তাহার স্বামী আসিতেছেন, গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রতিবেশী বলিয়া আমার নিমন্ত্রণ। মেয়েটিকে দেখিয়াই চিনিলাম, বয়স বাড়িয়াছে, বুঝিলাম আবার নূতন করিয়া ভাব করিতে হইবে।

মেয়েটিকে আট্‌কাইলাম। বলিলাম, আমার বাড়ীতে কিছু খাইয়া না গেলে আমি তাহার বাবার বাড়ীতে গিয়া আজ কিছুতেই কিছু খাইব না। কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল দুলাইয়া কচিহাতে সরু সোনার বালাগুলি বাজাইয়া তাহার মায়ের মত উজ্জ্বল নয়নে চাহিয়া সে প্রথমে বিশেষ আপত্তি জানাইল। কিন্তু বিস্কুটের টিন, গরম গরম জিলিপি ইত্যাদি বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপত্তির বেগ কমিতে লাগিল। তারপর যখন অপরিচয়ের পর্দা একবার উড়িয়া গেল, সে আমাকে পরম আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিল, কোন আব্দার করিতে তাহার বাধিল না, টেবিলের উপর লালনীল পেন্সিল, ঝিনুক বসানো কাগজচাপা, দেওয়ালে এক পাখীর ছবি ইত্যাদি নানা দ্রব্য সম্বন্ধে তাহার পাইবার ইচ্ছাকে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিল এবং যখন সে দ্রব্যগুলি পাইল তখন এমন ভাবে গ্রহণ করিল, এ যেন তাহার প্রাপ্য, স্বাভাবিক অধিকার।

এক পাড়ায় থাকি বলিয়া সুরেনের বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ হইল, কলেজের সেই পুরাতন বন্ধুত্ব ঝালাইয়া জমাইয়া লইলাম। পাটের দালালি করিয়া সুরেন এখন লক্ষপতি।

ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব করিবার সুখ ও সুবিধা এই যে তাহারা যাহাদের বন্ধুভাবে অন্তরে গ্রহণ করে তাহাদের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে কোন সঙ্কোচ বা সন্দেহ রাখে না। নিঃসঙ্কোচে তাহারা মনের কথা বলে, নির্ব্বিবাদে তাহারা গ্রহণ করে, নিঃসন্দেহে তাহারা আপন কর্ত্তৃত্ব-অধিকার জারী করে। কিন্তু কোন বয়স্ক নূতন লোকের সহিত বন্ধুত্ব পাতাইতে গেলে সংসার-সমাজের নানা রীতিনীতি বাঁচাইয়া নানা অভিযোগ-অধিকারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হয়। তাই ধনীবন্ধু ও বন্ধুপত্নীর আশা ছাড়িয়া এই বালিকাবন্ধুর বন্ধুত্বের উপর আমার পরম লোভ হইল। বেণু প্রথম দিনই আমার হৃদয় জয় করিয়াছিল, প্রতিদিন কত খেলায় গল্প করায় বেড়ানোয় আমাদের বন্ধুত্ব জমিতে লাগিল।

তারপর কোন্ অজানা শুভ মুহূর্ত্তে জানি না। এই সরলা বালিকার হাত ধরিয়া সুরেনের প্রাসাদের দরওয়ান-রক্ষিত গেট পার হইয়া চাটুকার-স্বর-গুঞ্জিত চুরুটধূমপূর্ণ তাস-ক্রীড়া-শব্দমুখর ভীতিপ্রদ বৈঠকখানাঘরগুলি ছাড়াইয়া স্নিগ্ধ অন্তঃপুরে যেখানে কল্যাণী লক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা, তাঁহার আনন্দগৃহে আসিয়া পৌঁছাইলাম। আমার কিশোর প্রেম যাহার ঘরে পৌঁছাইয়া ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল, আমার যৌবন প্রেম যাহার রুদ্ধদ্বারে বারবার করাঘাত করিয়াও খুলিতে পারিল না, এ মেয়েটির ভালবাসার স্পর্শে কোন্ যাদুমন্ত্রে সে দুয়ার খুলিয়া গেল— প্রেমদীপদীপ্ত শান্তি-উজ্জ্বল মাধুর্য্যময় সে পুণ্যগৃহে আনন্দকম্পিত

হৃদয়ে প্রবেশ করিলাম। সত্যই একদিন বেণুর আব্দারে তাহার মাতা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন।

তারপর সাত বছর কাটিয়া গিয়ছে—বেণুর আদর আব্দার-মাখানো হাসি-চুমোয়-ভরা কত কবি-ঔপন্যাসিকের রঙ্গীন-কল্পনা-জড়ানো সাত বৎসর।

লেখা শেষ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া এই বইয়ে-ভরা ঘরটির দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, আমি যখন কত দেশের কত যুগের কত তরুণ-তরুণীর প্রেমের কাহিনী পড়িতেছিলাম, আমার এই ঘরে আমার পরিচিত দুই তরুণ-তরুণী তাহাদের প্রেমের কাহিনীর ভূমিকা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহা কে জানিত।

চাকর দরজা খুলিয়া জানাইল, একটি ছেলে দেখা করিতে আসিয়াছে। খুব রাগের ভান করিয়া বসিয়া যুবকটিকে ডাকিতে বলিলাম। দেখিলাম, বেচারা সারাদিন ভাবিয়া বাস্তবিকই শুকাইয়া গিয়াছে। বসিতে বলিলাম, দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরে চিঠিখানি বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়া কপট গর্জ্জন করিয়া বলিলাম, কে এ চিঠি লিখেছে?

নগর গ্রাম হইতে বহুদূরে জনহীন অরণ্যে একসঙ্গে তিনটে টায়ার সশব্দে ফাটিয়া গেলে মোটর-চালকের যেমন মুখ হয়, তেমনি মুখ করিয়া সে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

বেণুর সহিত বেশী মিশিয়া মনটা বড় নরম হইয়া গিয়াছে, যুবকটির উপর বড় করুণা হইল। মৃদু হাসিয়া অভয় দিয়া বলিলাম, বোসো। তার পর তাহার বাবা মা পরিবার বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে নানা কথা, তাহার নিজের বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিয়া সকল তথ্য জানিতে লাগিলাম। সে পিতার একমাত্র পুত্র, পিতা ধনী ব্যবসাদার, জাতিতে কায়স্থ, এসব খবর জানিয়া বেণুর সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আচ্ছা, যাও, বলিয়া আবেগের সহিত কোনমতে তাহাকে বিদায় দিলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, বেণু আসিল না। মৃদু জ্যোৎস্নার আলোর দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতেছিলাম, পদশব্দে চমকিয়া উঠিলাম, দেখি, বেণুর বাবা ও মা আসিয়াছেন।

বলিলাম, আসুন, অনেক দিন পরে একটা গল্প লিখলুম, তাই শোনাবার নিমন্ত্রণ।

তাহার মাতা হাসিয়া বলিলেন, আপনার প্রধানা শ্রোত্রীটি কোথায়? ধীরে বলিলাম, তাকে ত সারাদিন দেখি নি, কি জানি কোথায় আছে। আপনারাই শুনুন।

পাশের ঘরে আলো থাকিলে দেখা যাইত, আমার শ্রোত্রীটি তার পুরাতন বন্ধুকে ভুলিয়া গিয়া নূতন বন্ধুর সঙ্গে দিব্য গল্প করিতেছে।

ধীর কম্পিত কণ্ঠে সারাদিনের লেখা গল্পটি পড়িলাম। কাগজ হইতে এক নিমেষের জন্যও চোখ তুলিতে পারি নাই, হাত কাঁপিতেছিল কি না জানি না।

পড়া শেষ করিয়াও অবনত মুখে বসিয়া রহিলাম।

বেণুর বাবা যেন শুধু বলিল, কি আশ্চর্য্য, আমি এটা আগে ভাবি নি!

নিমেষের জন্য শান্তির চোখের উপর চোখ পড়িল, সে চোখ দু'টি যেন বলিল, আমি কিন্তু বরাবর জানতুম এ অজানা বন্ধু কে।

তারপর নতমুখেই কার্পেটের পাখী ও ফুলগুলির দিকে চাহিয়া বেণুর প্রেমের কথা, চিঠির কথা, আমার ছাত্র যুবকের কথা বলিলাম; বলিলাম, তাহাদের নিকট এ জীবনে কখনও কিছু চাহি নাই, এই একটি ভিক্ষা চাহিতেছি।

বেণুর মা ধীরে উঠিয়া আসিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আপনি একটুও ভাববেন না, আমার খুব মত আছে।

বেণুর বাবাও উঠিয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়া বলিলেন, বিনির বে আপনি যেমন খুসি দেখে শুনে দেবেন, আমরা একটুও আপত্তি করবো না।

আমি কিন্তু তেম্নি নতমুখে বসিয়া রহিলাম। তাঁহারা দু'জনেই স্তব্ধ। সহসা ঘরটি যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, কে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল, কাহার কালো চুলে টাক ছাইয়া গেল, অশ্রুঘন চোখে দৃষ্টি তুলিয়া দেখি—বেণুর কানের সোনার ইয়ারিঙের চুনীটা চোখের সাম্‌নে ঝক্‌মক্ করিতেছে।

পাশের ঘর হইতে বেণুর বাবার গলা শোনা গেল, আমার ছাত্রটিকে বলিতেছেন, ইয়ং ম্যান, তোমার সাহস দেখে খুসী হয়েছি, তোমার বাবার নাম ও ঠিকানাটা আমায় লিখে দাও।

বিনিদ্র রাত্রি, ঘড়িতে একটা বাজিল, চুপ করিয়া পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় বসিয়া আছি, নীলসিল্কের কাপড়ে বাঁধানো ব্রাউনিঙের কাব্যগ্রন্থগুলির সোনার জলের লেখায় জ্যোৎস্না ঝিকিমিকি করিতেছে, কবি কি আনন্দে বলিতেছেন, খুসী হইয়াছি।

চুপ করিয়া বসিয়া আছি, কি ভাবিতেছি জানি না, অদৃশ্য শিল্পী নীরবে বসিয়া মনের পটে কি ছবি আঁকিতেছে ?

শিল্পী, তুমি কি লিখিতে চাও ? সারাজীবনে কি লিখিলে, আরও কি লিখিবে, আমাকে তাহার একটু অর্থ বুঝাইয়া দাও। আমরা ভাবি, প্রাণের রাঙা রক্তের কালিতে ঘটনার পর ঘটনার কথা সাজাইয়া আপন খুসী মত নিজ জীবনের গল্প লিখিয়া যাইব, কলম ত তুমি আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছ ; কিন্তু কেন দুঃখের অগ্নিরাঙা রেখা দিয়া লেখার মাঝে মাঝে জ্বালাইয়া দাও, বিচ্ছেদের শুভ্র অশ্রুরেখা দিয়া কাটিয়া দাও, মৃত্যুর কালো তুলি বুলাইয়া দিয়া হঠাৎ কোন পাতা মুছিয়া দাও—দুঃখসুখের পাত্র ভরিয়া তুমি কি পান করিতে চাও ? কলম ত তোমার হাতে দিতে চাই, তুমি নাও না কেন ? তোমার অদৃশ্য তুলি দিয়া কি আঁকিতেছ আমায় বুঝাইয়া দাও।

জান্‌লার কাচ দিয়া জ্যোৎস্নার ধারা আমার বিছানায় ঝরিয়া পড়িতেছে। এই অনুপম আলোর একটি উপমা আমি প্রায়ই ভাবি—তাহা প্রিয়ার চুম্বন নয়, প্রেমিকজনের চাউনি নয়, তাহা শিশুর হাসি।

সোনার হরিণ

সারারাত্রি এ জ্যোৎস্নাময় নীলাকাশের দিকে চাহিয়া শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে,—ওই চাঁদটি, ও যেন বেণুর হাসির উপর আমার এক ফোঁটা চোখের জল ঝক্‌মক্ করিতেছে।

সন ১৩২৮

অলকা

বৌদি—এই বাড়ী ?

এই বাড়ীই ত বোধ হচ্ছে।

বোধ হচ্ছে কি, নিজের বাড়ী চেন না ?

হাঁ ভাই, এই যে দরজা, এই বাড়ী।

প্রকাণ্ড রল্‌স রয়স্‌ গাড়ী এক হল্‌দে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অলকা নিজেই তাড়াতাড়ি মোটরের দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল। নিজের বাড়ীর চিরপ্রিয় পরিচিত দরজাটা দেখিয়া তাহার বুক যেন দুলিয়া উঠিল। রাত্রের অন্ধকারে গ্যাসের আলোয় কাঠের দরজা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, সমস্ত বাড়ী ধূসর রঙের ছায়ামূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া। অলকার কল্পনার রঙে বাড়ীর সম্মুখটা সুন্দর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

থাক্‌ ভাই, তোমাকে আর নামতে হবে না, দরজা খোলাই রয়েছে দেখছি।

বাড়ীতে নেমে আর দেরী সইছে না ? কাল যাবে নাকি ?

যাব বৈ কি। পার যদি আমাদের তুলে নিয়ে যেও।

বরকনে ত বিকেলে বিদায় হবে। আমি দুপুরে গাড়ী নিয়ে আসব।

আচ্ছা ভাই।

নিঃশব্দচারী রল্‌স্‌-রয়স্‌ মশালের মত দুই চোখ জ্বালাইয়া

গলি দিয়া বাহির হইয়া গেল। অলকা হাতের দুইটি গোলাপফুল দুলাইয়া দরজা ঠেলিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। এই গোলাপফুল দুইটি সে তাহার অসুস্থ স্বামীর জন্য বিবাহবাড়ী হইতে লইয়া আসিয়াছে।

বরকনের কথা, নিমন্ত্রণের ভিড়ের কথা, নিজেদের বিবাহিত জীবনের কথা, স্বামীর কথা, ভাবিতে ভাবিতে অলকা চকিত পদে বৈঠকখানার পাশ দিয়া দেউড়ী'পার হইয়া উঠানের পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। বাড়ীখানি অন্ধকার, নিঝুম, সবাই নিদ্রিত। খোলা ছাদের সম্মুখে ঘরের উন্মুক্ত দরজার সম্মুখে আসিয়া অলকা দাঁড়াইল। দরজা খোলা। সে একটু সরিয়াছে, আর স্বামী দরজা খুলিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া খাইতেছেন! সজোরে সশব্দে দরজা টানিয়া বন্ধ করিয়া দরজার পাশের আলো উস্কাইয়া অলকা ডাকিল, ওগো, ঘুমোচ্ছ?

অন্ধকার ঘর সহসা আলোয় উজ্জ্বল হওয়াতে তাহার চক্ষু একটু ধাঁধিয়া গেল, কিছু দেখিতে পাইল না, কোন উত্তরও আসিল না।

স্বামী হয়ত ঘুমাইতেছেন ভাবিয়া সে আলোটা এক কোণে রাখিয়া ধীরপদে ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইল। পথে গোখ্‌রো-সাপের গায়ে অতর্কিতে পা দিয়া সাপের দিকে চাহিয়া পথিক যেরূপ চমকিয়া উঠে, তেম্নি অলকা চমকিয়া উঠিল। একি! এ কোথায় সে! কার এ ঘর? এ ত তাহার ঘর নয়। কোথায় তাহার 'মেহগনি-কাঠের পুষ্পচিত্রিত খাট, তাহার ড্রেসিং-টেবিল, কাপড়ের আলমারি, ভেল্‌ভেট-মোড়া কোচ, তার সুন্দর আলনা!

একটা সেগুনকাঠের তক্তার উপর এক ছেঁড়া মাতুর পাতা, দুটো বালিশ দুই কোণে পড়িয়া আছে, ওয়াড়গুলি কতদিন ধোবার বাড়ীর মুখ দেখে নাই, তাহার উপর সরু মোটা ছেঁড়া বাঁধানো কত-রকমের বই ছড়ান। কেহ তক্তায় শুইয়া নাই ত! অলকা আলো আনিয়া দেখিল, না. কেহই শুইয়া নাই। তক্তার একদিকে কাঠের টেবিল, তাহাব উপর বই খাতা কাগজ সিগারেটের বাক্স ফাউনটেনপেন বাঁশী ইত্যাদি স্তূপীকৃত ছড়ান। আর একদিকে র‍্যাকে বই ম্যাগাজিন কাপড় জামা ইত্যাদি ঠাসা। মেজেতে ছেঁড়া ও আস্ত কাগজ, চুরুটের ছাই, ব্লটিং-কাগজ, মাসিক পত্রেব কোন ছবি, একখানা রুমাল ইত্যাদি ছড়ান।

আলোটি টেবিলেব উপব একটু জায়গা করিয়া রাখিয়া ঘবেব মূর্ত্তি দেখিয়া অলকা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, দেখিল, তাহাব কালো ছায়ামূর্ত্তি সাদা দেওয়ালে বাঁশপাতার মত কাঁপিতেছে। সম্মুখের চেয়ার সরাইয়া সে দরজার দিকে ছুটিল, চেয়াব হইতে কয়েকখানা খাতা ও বই মেজেতে পড়িয়া গেল। অলকা দরজা ঠেলিয়া টানিয়া খুলিতে গেল, দরজা খোলে না। একি! দবজা বন্ধ কে করিল? ও, বাহিরের ছিটকিনি পড়িয়া গিয়াছে। সে যখন ঘরে ঢুকিয়া জোরে দরজা বন্ধ করিয়াছিল তখন বাহিবের লোহার ছিটকিনি পড়িয়া গিয়াছিল।

বন্দিনী সে! কোথায়? এবার বুঝি সে চীৎকার করিয়া উঠে, ওগো, কে আছ দরজা খোল। বুক দুরদুর করিতে লাগিল। হয়ত এটা একটা মেস, একটু শব্দ হইলেই এঘর

ওঘর হইতে ছেলের দল বাহির হইয়া আসিবে। কাল সকালে কাগজে কাগজে বাহির হইবে, এক প্রসিদ্ধ উকিলের স্ত্রী রাত্রে এক মেসে কলেজের ছেলের ঘরে! চেঁচাইতে সাহস হইল না। যে ছেলেটির ঘর, সে আসুক, তাহাকে বুঝাইয়া বলিলে নিশ্চয় সে চুপি চুপি তাহাকে বাড়ী দিয়া আসিবে। আজকালকার ছেলেরা ত খুবই ভাল, নারী যে দেবী, এ সম্বন্ধে মাসিকপত্রিকার প্রবন্ধ পড়িয়া পড়িয়া তাহার অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল।

দুই তিনবার জোরে দরজা টানিল, একটু শব্দ হওয়াতে আর অলকার সাহস হইল না।

ধীরে ধীরে তাহার ভয় কমিতে লাগিল। ব্যাপারটা ভাবিয়া একটু হাসি পাইল। সুন্দর মুখে মিষ্টি হাসি খেলিয়া গেল। সে, অলকা, সাতাশ বছরের নারী, দুই সন্তানের জননী, এক খ্যাতনামা উকিলের স্ত্রী, বিবাহের নিমন্ত্রণ খাইয়া ভুল করিয়া এক ছেলেদের মেসে আসিয়া উঠিয়া এক যুবকের ঘরে আপনি দরজা বন্ধ করিয়া আপনাকে বন্দিনী করিয়াছে।

রাত্রি ত অনেক হইয়াছে। সে ছেলেটি হয়ত কোন বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছে, কখন আসিবে? সারারাত্রি এ ঘরে সে বন্ধ থাকিবে? আচ্ছা, ছেলেটির জামাকাপড় পরিয়া গরাদ-হীন খোলা জানলা দিয়া ছাদে লাফাইয়া পড়িয়া গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেলে কেমন হয়! সে মনে মনে হাসিয়া উঠিল। সে বাঙ্গালী-ঘরের বধূ, একটু ভয়ও হইল। বাস্তবিক কি করা যায়?

ধীরে অলকা ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইয়া আলনার উপর হইতে

গাদার মধ্যে বসিয়া পড়িল। টেবিলের উপরের আলো তাহার শঙ্কারুণ মুখে, পানে-রাঙা ঠোঁটে, কালো কেশের উপর, শাড়ীর রাঙা ফুলপাড়ে, কানের দুই লাল দুলে ঝিকিমিকি করিতে লাগিল। অলকা উদাসভাবে বসিয়া আন্‌মনা হইয়া টেবিলের উপরের বইখাতা সব ঘাঁটিতে লাগিল। বেশীর ভাগই কবিতার বই, ইংরেজী, ফরাসী, ফার্সী কবিদের। একদিকে রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপির বই রহিয়াছে—ওই 'কেতকী' 'শেফালি' 'গীতিবীথিকা'—স্বরলিপির বইগুলি তাহার অতি প্রিয়। সহসা তাহাদের দেখিয়া যেন পুরাতন বন্ধুদের মুখের দেখা পাইয়া তাহার মন একটু প্রফুল্ল হইল। পাতাগুলি উল্টাইয়া রাখিয়া দিল। একটা ঘন-নীল মরক্কো চাম্‌ড়ায় বাঁধান খাতা খুলিতে প্রথম পাতার এক কোণে একটা নাম তাহার চোখে পড়িল—অলককুমার রায়। একটু বিস্মিত হইয়া অলকা আবার পড়িল, নামটি চেনা-চেনা। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার ধরণে নামটি লেখা। অলকা খাতা খুলিয়া দেখিল, ভিতরে কবিতা লেখা।

তাহার সুন্দর মুখ ঝিল্‌মিল্ করিয়া উঠিল। সে এক কবির ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। অলককুমার রায়—হাঁ, এঁর কবিতা সে কত মাসিক পত্রে আগ্রহ ও আনন্দের সহিত পড়িয়াছে, চমৎকার কবিতা লেখেন ইনি। প্রথম যখন এঁর ফুলের কবিতা বাহির হয়, সে তাহার স্বামীকে পড়িয়া শুনাইয়াছিল, স্বামীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া সে একটু অবাক হইয়াছিল। তারপর স্বামী বলিলেন, যাক্, ছদ্মনাম যে নিয়েছ, খুব সুবুদ্ধির কাজ

করেছ, না হলে ললিত আর নবীন ত তোমার সঙ্গে আলাপ না করে আমায় ছাড়্‌ত না।

বস্তুতঃ অনেকেই ভাবিয়াছিল, সে-ই কবিতা লিখিতেছে, তাহার নাম অলকা রায় কিনা। এ ভুল ধারণা এখনও তাহার স্বামীর মন হইতে দূর হয় নাই, মাঝে মাঝে তিনি ব্রিফ ফেলিয়া অলককুমারের কবিতা পড়িতে বসেন। সে কখনও কিছু লিখিতে বসিলেই তাঁহার প্রশ্ন হয়, কোন্ মাসিকে কোন্ মাসে বের হবে!

সেই অলককুমারের এই ঘর! ঘরখানি কি রহস্য-মণ্ডিত, কি অপরূপ-স্বপ্ন-বিজড়িত হইয়া তাহার চোখে দেখা দিল! অলকের দু-একটি কবিতে পড়িতে অলকা চেষ্টা করিল, প্রথম দু'এক লাইন পড়িয়া আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। আলো আরো উস্কাইয়া দিয়া ঘরখানি সে দেখিতে লাগিল। এই জিনিষপত্র ছড়ান হেলাফেলা-মাখান ছোট ঘর এক কবির খুসি দিয়া ভরা, কত স্বপ্ন-জড়ান। অতি আদরের সহিত সে টেবিলের জিনিষপত্র-গুলি ছুঁইয়া নাড়িয়া দেখিতে লাগিল। এই ফাউণ্টেন পেনে তরুণ কবি লেখে, এই টেবিলের উপর মাথায় হাত দিয়া সে ভাবে, এই বইগুলি তাহার প্রাণের ব্যথার সাথী, এই চেয়ারে বসিয়া সে কত গত দিনের কত অনাগত যুগের স্বপ্ন দেখে।

ধীরে অলকা তক্তা হইতে উঠিয়া বেতের চেয়ারে গিয়া বসিল; একটু দুলিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু চেয়ারের অবস্থা দেখিয়া সাহস হইল না। চেয়ার হইতে যে বই-খাতা কাগজগুলি মেজেতে ফেলিয়া দিয়াছিল, সেগুলি ধীরে তুলিয়া টেবিল সাজাইতে সুরু

করিল। কি অ-গোছাল ঘরটা! সে তাহার কল্যাণ-হস্তের শ্রীতে চারিদিক মণ্ডিত করিয়া তুলিবে। বইয়ের উপর বই চাপান, বেশীর ভাগ বই খোলা পড়িয়া রহিয়াছে, পড়িতে পড়িতে খুলিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থখানি মানসসুন্দরী কবিতার পাতায় খোলা, তাহার উপর চাবির রিং পড়িয়া রহিয়াছে। চাবির গোছা সরাইয়া অলকা বইখানি তুলিয়া লইল, নীল-পেন্সিলের দাগ চোখে পড়িল,—

—সেই তুমি
মূর্ত্তিতে দেবে কি ধরা? এই মর্ত্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?

বইখানি টেবিলের উপর খোলাই রাখিয়া দিল, টেবিল আর সাজান হইল না, অলকা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার দেহের রক্ত যেন ঝিল্‌মিল্ করিতেছে, আল্‌তা-মাখা পায়ের নখ হইতে সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে দুইখানি খোলা কাগজ ছিল, তাহা টানিয়া অলকা পড়িতে বসিল। এ তরুণ কবির অপ্রকাশিত নূতন লেখা, সে পড়িতেছে! কয়েকটা লাইন পড়িল—

যাবার সময় সে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলে, সেই অনুপম মুখের অতুলন হাসি, কোথায় আমি তাকে ধরে' রাখব? প্রিয়, আমার মানস-লোকের স্মৃতি-অলকায় সে হাসি চির-অম্লান পারিজাতের মত ফুটে আছে। এ পৃথিবীতে প্রভাতের ফুল সন্ধ্যায় ঝরে' পড়ে, বর্ষার ময়ূর হেমন্তে পেখম মেলে নাচে না, ভাদ্রের ভরানদী শীতের দিনে শীর্ণ হয়ে আসে,

পূর্ণিমার চাঁদ ঝড়ের মেঘে ঢাকা পড়ে, বসন্তের শেষে কোকিল কোথায় উড়ে যায়, শুধু ঝরাপাতার দীর্ঘনিশ্বাসে করুণ ক্লান্ত সঙ্গীত, সব ঝরে' যায়, চলে' যায়, হারিয়ে যায়, কিন্তু বন্ধু, তোমার একটি কথার ফুল, একটি হাসির গান, চোখের একটি চাউনির আলো ত আমার কাছে হারায় নি, শেষ হয় নি,—আমার প্রেমের স্বর্গলোকে সে ফুল, সে গান, সে আলো অমর অম্লান হয়ে আছে। তোমার সে যাবার বেলার হাসি—

অলকা আর পড়িতে পারিল না, মুক্তার মালার মত তার দাঁতগুলির পাশে রাঙা ঠোঁটখানি পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত কি আবেগে দুলিয়া কাঁপিতে লাগিল। কে সে বন্ধু? কাহার হাসি দেখিয়া কবি এই কথাগুলি লিখিয়াছে?

এখন হঠাৎ যদি অলক দরজা খুলিয়া আসে, দেখে তাহার চেয়ারে বসিয়া একটি অলঙ্কৃতা সুন্দরী নারী তাহার মনের লেখা পড়িতেছে!

সাদা দেওয়ালে নিজের কালো ছায়ামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া অলকা যেন কোন্ স্বপ্নের ঘোরে কি ভাবিতে লাগিল—তাহার মনে আর যেন কোন ভয় নাই, এ ঘরে সে নিরাপদ, এ যেন কোন চিরপরিচিতের ঘর।

বড় গরম বোধ হইতে লাগিল। মাথার সোনার সেফ্‌টিপিনটা খুলিয়া মাথার কাপড় খসাইয়া ব্লাউজের একটা বোতাম খুলিয়া, চুলগুলি মেলিয়া দিয়া সে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের অন্ধকার আকাশ তারায় ঝলমল করিতেছে, অতিক্ষীণ চাঁদের আলো। শার্শীর কাঠে মাথা

ঠেকাইয়া দাঁড়াইতে অলকা দেখিল, দেওয়ালে শার্শীর কাঁচে কি সব পেন্সিলে লেখা—নিশ্চয় কবিতা। ঘননীল আকাশে তারার অক্ষরের লেখার মত এই সাদা দেওয়ালে কালো অক্ষরে তরুণ প্রাণের কি সব কথা লেখা। অলকা আলো আনিয়া পড়িবে ভাবিল, কিন্তু মনে ততখানি উৎসাহ খুঁজিয়া পাইল না। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা অদূরে গির্জ্জার ঘড়িতে বাজিল—টং। বাহিরের রাত্রির অন্ধকার এক ভারী গোলার মত ছুটিয়া আসিয়া তাহার বুকে যেন আঘাত করিল—টং।

এতক্ষণ যেন কোন্ স্বপ্নমায়ায় সে সব ভুলিয়াছিল, আবার নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া অলকা ভীত হইয়া উঠিল। সত্যই কি এম্‌নি করিয়া এখানে রাত কাটাইতে হইবে? কটা বাজিল? একটা, না দুটো? ঘড়ি দেখিবার জন্য টেবিলের দিকে ছুটিল, টেবিলের এক কোণে খোলা গীতপঞ্চাশিকার একটা গান চোখের সম্মুখে পড়িল—

"ওরে সাবধানী পথিক বারেক
পথ ভুলে মর ফিরে।"

বইটা টানিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে অলকার ইচ্ছা হইল। বই সব সরাইয়া সে ঘড়ি খুঁজিতে লাগিল, কোথাও ঘড়ি নাই।

গির্জ্জার ঘড়িতে বাজিয়া যাইতে লাগিল—টং—টং—টং……
কত যে গণিয়াছিল মনে নাই। ও, ঠিক, বারটা বাজিল, অলকা একটু আশ্বস্ত হইল। না, আর দেরি করিলে চলিবে না, তাহাকে এইক্ষণেই ঘর হইতে বাহির হইতে হইবে। বাড়ীখানা

কি স্তব্ধ, একটু শব্দ নাই, একি পোড়ো বাড়ী, না ভূতের বাড়ী, হয়ত বাড়ীতে কেহই নাই। না থাকে ভালই, সে জোর করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া যাইবে। জানালা দিয়া নামা যায় কি না দেখিবার জন্য অলকা জানালার কাছে আসিল। অলকা শিহরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

এ কি সুর অন্ধকারে রণিয়া উঠিতেছে! এ কি মধুর শব্দ! সে ত আপনার অজ্ঞাতসারে গান গাহিতেছে না? না, এ ত তাহার কণ্ঠ নয়, অন্য কে গাহিতেছে? কোন্ দিকে?

"যখন তুমি বাঁধ্‌ছিলে তার—"

ব্যস্, গান বন্ধ হইল, এবার বেহালা বাজিতেছে। সে কি সমস্ত ব্যাপারটা একটা স্বপ্ন দেখিতেছে? এ কি ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল, না, ছাদে বসিয়া কেউ বেহালা বাজাইতেছে। ও, নিশ্চয় অলকবাবু ছাদে বেহালা বাজাইতেছেন, কি করুণ মিষ্ট সুর! যেন হৃদয়ের ব্যথা গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

বেহালা যতক্ষণ বাজিল, অলকা মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। কিন্তু বেহালা বাজান থামিতেই অলকার ভয় হইল। সত্যই অলকবাবু ছাদে আছেন, এক্ষুণি হয়ত ঘরে আসিয়া ঢুকিবেন। তাহাকে পালাইতে হইবে, যাহা করিয়া হোক পালাইতে হইবে।

বনে আগুন লাগিলে হরিণী যেমন ছোটে তেমনি করিয়া অলকা দরজার দিকে ছুটিল, দরজা টানিল,—ও, দরজা বন্ধ! ভুলিয়া গিয়াছিল যে দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোনরকমে

খোলা যায় না? শিকারের সম্মুখে বাঘিনী যেমন চাহিয়া থাকে তেমনি করিয়া দরজার দিকে অলকা চাহিল।

হাঁ, ওঃ, কি বোকা সে! বাস্তবিক নারীজাতি অল্পবুদ্ধি, এ আইডিয়াটা তাহার মাথায় আসে নাই! দরজার যে ঝিলিমিলি রহিয়াছে, তাহা সে দেখে নাই! ঝিলিমিলি দিয়া হাত গলাইয়া বাহিরের ছিটকিনি ত বেশ খোলা যায়। কিন্তু অলকবাবু যদি আসিয়া পড়েন! না, তিনি গান ধরিয়াছেন, কি সুন্দর গলা!

আর বিলম্ব কোরো না গো
ঐ যে নেবে বাতি—

না, গান শুনিলে হইবে না, এই দরজা খোলার সুযোগ, কোন শব্দ শোনা যাইবে না।

ধীরে অলকা নত হইয়া ডান দিকের খড়খড়ি খুলিয়া বাহিরে হাত গলাইয়া ছিটকিনি খুলিতে চেষ্টা করিল। পাখিগুলি চুড়ির উপর চাপিয়া ধরিল। আঃ, চুড়িগুলো! কি ঝঞ্ঝাট গয়না পরা! হাত বাহির করিয়া চুড়িগুলি টানিয়া তুলিয়া আবার সে পাখির ভিতর হাত ঢুকাইয়া ছিটকিনি তুলিতে চেষ্টা করিল, আঙুলের প্রান্ত লোহার ছিটকিনির মাথায় গিয়া ঠেকিল, ছিটকিনি একটুও নড়িল না। আবার হাত টানিয়া বাহির করিয়া আনিল, সোনার চুড়িগুলি ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মাথার একটা কাঁটা খুলিয়া লইয়া আবার পাখির ভিতর হাত দিয়া ছিটকিনির মাথায় কাঁটা লাগাইয়া টানিল। আঃ ছিটকিনিটা একটুও নড়ে না! অলকা দাঁত দিয়া নিজের ঠোঁট কাটিয়া ফেলিল।

'খট্'—এমন মধুর শব্দ সে জীবনে যেন শোনে নাই, ছিটকিনি উঠিয়াছে—ধীরে দরজা টানিয়া একটু ফাঁক করিয়া অলকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

দরজা ত খুলিল, কিন্তু গানও যে শেষ হইল! সত্যই যদি অলকবাবু তাহাকে দেখিয়া ফেলে! তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। দরজা খুলিতে সাহস হইতেছিল না, সে কি লজ্জা!

অলকবাবু গানের শেষ লাইনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, আর দেরী নয়। মরিয়া হইয়া অলকা দরজা খুলিল। দেখিল, ছাদের সম্মুখভাগ ঘরের ছায়া পড়িয়া অন্ধকারময়, পিছনভাগ একটু চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল, সেই স্নিগ্ধ মৃদু আলোয় একটি মূর্ত্তি ছায়ার মত বসিয়া। কি সুন্দর তাহার পিছনটা, কি ঝাঁকড়া বড় চুল! অতি মৃদুস্বরে বেহালা বাজাইতে বাজাইতে সে গান করিতেছে।

লোকটি পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া অলকার মনে কোন ভয় রহিল না, দুঃসাহসিনীর মত সে পা টিপিয়া টিপিয়া ছাদের দিকে অগ্রসর হইল। মূর্ত্তিটিকে ভাল করিয়া না দেখিয়া যাইতে তাহার মন সরিতেছিল না। কোন্ মায়ামন্ত্রবলে সে অলকের খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বেহালার সুর মায়াবীর মত তাহাকে যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ছাদে যেখানে অন্ধকারের কোলে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেই আলো-অন্ধকারের মিলন-রেখায় আসিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

সহসা বেহালা বাজান থামিয়া গেল, যেন বেহালার একটা

তার ছিঁড়িয়া গেল। অলক মুখ ফিরাইয়া পিছনে চাহিল, দেখিল অন্ধকারে এক নারীমূর্ত্তি রঙীন স্বপ্নমায়ার মত দাঁড়াইয়া! তাহার দীর্ঘপল্লবঘন ভাবদীপ্ত চক্ষু দুইটি জ্বল্‌জ্বল্‌ করিয়া উঠিল। হাত হইতে বেহালাটা পড়িয়া গেল, সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপ করিল না, সে তন্ময় হইয়া এই প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্তব্ধ রঙিন ছায়ার দিকে চাহিয়া রহিল! প্রেতাত্মারা শুভ্রবসনমণ্ডিত হইয়া ত দেখা দেয়, এ যে আগুনের শিখার মত রাঙা। এক মাস হইল, যে তরুণী বন্ধুকে সে চিরদিনের জন্য হারাইয়াছে, তাহাকে যে দেখিতে পাইবে সে আশা সে করে নাই। অলক দুই চক্ষু ভরিয়া সেই রঙীন ছায়াকে যেন পান করিতে লাগিল, তরুণী বন্ধুর নাম উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল, হাঁ, এই রকম জমাট রক্তবিন্দুর মত তাহার দুই কানে দুল দুলিত, তাহার গলার হার ঝিকিমিকি করিত, এই রকম তার মুখখানি নিখুঁত ছিল, ওই রকম অন্ধকারে-হারা তারার মত তাহার চোখের চাউনি ছিল. হাঁ. অম্‌নি সুঠামভাবে সে দাঁড়াইত, অতি সুন্দর ভঙ্গীতে সে ঘুরিয়া মুখ ফিরাইত, চুলগুলি দুলিয়া উঠিত, এই রকম একখানি বেনারসী-শাড়ী সে তাহাকে উপহার দিয়াছিল, অমনি নৃত্যের তালে চঞ্চল পদে সে চলিয়া যাইত। এ কি কোথায় অন্ধকারে সে মিলাইয়া গেল, তাহার তরুণী বন্ধুর প্রেতাত্মা নিমেষের জন্য দেখা দিয়া চলিয়া গেল!

অলক হতাশভাবে সিঁড়ির অন্ধকারের দিকে ক্ষুধিত নয়নে চাহিয়া তাহার বহুমূল্যবান বেহালার উপর বসিয়া পড়িল, আকাশভরা তারাদের মধ্যে কোথায় সে হারাইয়া গেল?

অলকা যখন সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া নামিয়া শেষ ধাপে গিয়া পৌছিল, তাহার মনে হইল, এবার সে মুখ থুব্‌ড়াইয়া ধুলায় পড়িয়া যাইবে। সিঁড়ির রেলিং সজোরে ধরিয়া সে কাঁপিতে লাগিল, সিড়ির উপরের দিকে চাহিল, কেহ তাহার পিছন পিছন ছুটিয়া আসিতেছে কি না। উঠানের অন্ধকার এক নিদ্রিত দৈত্যের বিরাট হাঁ'র মত। দরজার ফাঁক দিয়া সেই অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বৈঠকখানা-ঘরটা যেন কি গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিতেছে, চাঁদের ক্ষীণ আলোয় সদর দরজায় যাইবার পথটা দেখা যাইতেছে।

অলকা রেলিং ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হাঁপাইতে লাগিল। তাহার বক্ষের স্পন্দন-ধ্বনির তালে তালে গলার হাব রিমঝিম সুরে বাজিতেছে। কি স্তব্ধ অন্ধকার! বাড়ীখানা শোক-মূর্চ্ছিতা সদ্যবিধবার মত! চোখ বুজিয়া অলকা দম লইতে লাগিল। উপরের দিকে নীচের দিকে চাহিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। যুবকটি তাহার দিকে শুধু নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল, তাহাকে ধরিতে ত আসিল না! যে চলিয়া আসিলে, পিছন পিছনও আসিল না!

একটু শ্রান্তি দূর হইতেই অলকা দ্রুতপদে সদর দরজার দিকে গেল। দরজার কড়া টানিয়া খুলিয়া রাস্তায় লাফাইয়া পড়িয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার শুধু ভয় হইতেছিল, এইবার বুঝি সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবে। একটু খস্‌খস্‌ ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ হইল। সে কাঁপিয়া উঠিল। না, কেহ নাই, এ তার শাড়ীর ও গহনার শব্দ।

অলকা মুক্তি পাইল বটে, কিন্তু নিজেদের বাড়ীতে কি করিয়া যাইবে! ভাল করিয়া ঘোমটা টানিয়া সে করুণ নয়নে এই বিজন স্তব্ধ আলোছায়াময় মৃদু গ্যাসালোকিত আঁকাবাঁকা গলির দিকে চাহিল। তাহাদের বাড়ী এই পাড়ার কাছাকাছি কোথায় হইবে। এ বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইতে কেমন ভয় করিতে লাগিল, সম্মুখে ধীরে অগ্রসর হইয়া গ্যাসের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। পাশের বাড়ীর নম্বরটা চোখে পড়িল, চার নম্বর। তাহাদের বাড়ীর নম্বর ত তেরো। কোন্ দিকে তেরো নম্বর? অলকা অগ্রসর হইয়া চলিল। হাঁ এই দিকেই, এই আশু-ডাক্তারের বাড়ী, দরজার গায়ে মার্ব্বেলের উপর লেখা নামটা দেখিল, ওই মধু-ময়রার দোকান। আর কয়েকখানা বাড়ী পার হইলেই তাহার বাড়ী।

এতক্ষণে তাহার মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল, বুকের স্পন্দন থামিল। বা, সে যেন কোন অভিসারিকা, সুপ্ত নগরের জনহীন পথ দিয়া কোন সঙ্কটময় রহস্যে তাহার যাত্রা, সম্মুখে অন্ধকার তারালোকে মিশিয়া গিয়াছে, দক্ষিণ-বাতাসে গাছগুলি উতলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হৃদয়ের নৃত্যের তালে তালে গলার হার পায়ের নূপুর বাজিতেছে। স্বামী সুস্থ হইয়া উঠিলে, তাঁহাকে এই রাত্রের কাণ্ড কিরূপ রং-চং দিয়া বলিবে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে সে নিজের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল।

হাঁ, এই ত তাহাদের বাড়ী। দরজাটা ভাল করিয়া দেখিল, নম্বরটা দেখিল, হাঁ, তেরো বটে। দুয়ার বন্ধ ছিল, জোরে ধাক্কা

দিতেই খুলিয়া গেল। দেউড়িতে চাকরটা ঘুমাইতেছে। দরজার খিল দিয়া অলকা ত্বরিতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেল।

ঘরের দরজা খোলা, আলো মিট্‌মিট্‌ জ্বলিতেছে। এবার সে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল না। আলো উস্কাইয়া ভাল করিয়া ঘরটি দেখিল। হাঁ, তাহারই ঘর বটে। ঘরের টেবিল চেয়ার জিনিষ সব যেন তাহার দিকে স্মিতহাস্যে চাহিয়া অভ্যর্থনা করিল। ঘরের প্রতি-জিনিষকে অলকার আদর করিতে ইচ্ছা হইল। আদর-মাখানো চোখে প্রিয় ঘরটির দিকে দেখিয়া সে স্বামীর খাটের দিকে গেল। স্বামী চুপ করিয়া শুইয়া আছেন, তিনি ঘুমাইতেছেন দেখিয়া সে প্রফুল্ল হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল। স্বামীর প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিতে করিতে সে সমস্ত পথ আসিয়াছে।

স্বামী হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, এত রাত হল? সে বলিবে, বিয়ে-বাড়ী।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিবেন, কিসে এলে? সে বলিবে, সুরেন-ঠাকুরপো দিয়ে গেল।

স্বামী বলিবেন, মোটরের শব্দ শুনলাম না? সে বলিবে, নিঃসাড় রল্‌স্‌-রয়স্‌ গাড়ী।

যাক্‌, কোন উত্তর দিতে হইল না।

অলকা কাপড় জামা বদ্‌লাইতে আরম্ভ করিল। ব্লাউজ খুলিতেই একখানি খাতা মেজেতে পড়িয়া গেল। তুলিয়া দেখিল, অলককুমারের সেই মরোক্কো-লেদার-বাঁধানো কবিতার

খাতা। কখন যে সে খাতাখানি অতর্কিতে ব্লাউজের ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছে তাহা সে নিজেও জানিতে পারে নাই।

ব্লাউজটা ছাড়িয়া শাড়ী না ছাড়িয়াই অলকা আলোটা উস্কাইয়া ঘরের কোণে সোফায় গিয়া খাতাখানি লইয়া পড়িতে বসিল।

খাতাখানির পাতাগুলি উল্টাইয়া সে উৎসর্গপত্রটা পড়িতেছিল। কবি তাহার এক তরুণী বন্ধুকে কবিতাগুলি দিয়াছেন, সে বন্ধুকে তিনি সারাজীবনের জন্য হারাইয়াছেন, কিন্তু তাঁর প্রাণের চির-অম্লান প্রেম-শতদলের উপর সে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী চির-অধিষ্ঠিতা।

স্বামীর কণ্ঠস্বর কানে আসিতেই অলকা চমকিয়া উঠিল, ওগো, এক গেলাস জল দাও না।

ও, তুমি এখনও ঘুমোও নি, বলিয়া মিষ্টি হাসিয়া অলকা স্বামীর দিকে চাহিল। ভাবিল, এবার বুঝি স্বামী জিজ্ঞাসা করেন, কার চিঠি পড়্‌ছ?

স্বামী কোন প্রশ্ন করিলেন না, পাশ ফিরিয়া শুইয়া একটু পরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তিনি যে জল চাহিয়াছেন তাহা অলকা শুনিতেই পায় নাই, সে খাতাখানি হাতে করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, কে সে তরুণী বন্ধু, কেমন সে দেখিতে? অলকের বেহালার সুর নিশীথরাত্রি ভরিয়া অলকার কানে বাজিতে লাগিল।

অলক তখন তাহার টেবিলের উপর গোলাপফুলগুলির প্রতি চোখের জলে-ভেজা-মুখে চাহিয়া অসহনীয় আনন্দের সঙ্গে

ভাবিতেছিল, সত্যই তাহার তরুণী বন্ধু আসিয়াছিল। এই কাঁচা সোনার রংএর গোলাপ ত তাহার খুব প্রিয় ছিল, তাহার অসুখের সময় এই রকম গোলাপই অলক তাহার জন্য কিনিয়া আনিত। এই গোলাপ দুটি সে দিয়া গিয়াছে, আর তাহার কবিতার খাতাখানি যে সে লইয়া গিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহার সুখের অবধি ছিল না। তাহার বন্ধুর মৃত্যুর পর সে এই ভাবিয়া দুঃখ পাইত যে এ লোক ও পরলোকের মধ্যে কথাবার্তার কোন উপায় নাই, সে কেমন আছে, জানিতে পারি না, তার কাছে একটি মনের কথা জানাইতে পারি না।

যে কবিতাগুলি তাহাকে স্মরণ করিয়া অলক লিখিয়াছে, সেগুলি সে নিজে লইয়া গেল! শুধু যদি সে একটি কথা কহিয়া যাইত, তার মিষ্ট গলার একটু সুর, একটি কথা শুনিবার জন্য কানদু'টো যে বুভুক্ষু হইয়া আছে।

তাহার শরীরের ভারে বেহালার একটা তার ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। সেই ভাঙ্গা-বেহালা লইয়া সে আবার ছাদের জ্যোৎস্নায় গিয়া বসিল।

সে রাতে অলক ও অলকা দুজনের কাহারও ঘুম হইল না।

ফাল্গুন ১৩২৯

সুধা

সন্ধ্যার রাঙা আলো চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে। সুধা তাহার ছোট কোলটির একদিকে সাত মাসের খোকাকে আর একদিকে তাহার প্রিয় বেড়াল পারুলকে লইয়া একটা আধপোড়া ভুট্টা খাইতে খাইতে ছাতে উঠিবার সিঁড়ির কোণের জানালায় বসিয়া সন্ধ্যার রাঙা আলোর দিকে উদাস নয়নে চাহিতেছিল। একবার খোকাকে আদর করিয়া একবার পারুলের পালকের মত পিঠে হাত বুলাইয়া মুখে ভুট্টা পুরিয়া দিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্নেহকে নিরপেক্ষভাবে বণ্টন করিতে চেষ্টা করিতেছিল। পারুল শান্ত ভাবে চোখ বুজিয়া সুধার কোলে পড়িয়া ছিল। শুধু, ভুট্টার দানা যখন তাহার মুখে পড়িতেছিল, একবার অতি অলস ভাবে চোখ অর্দ্ধেক খুলিতেছিল। দুধের মত সাদা তাহার দেহটা ঠেলা দিয়া সুধা বলিল, এই পারুল, ঠাকুর দেখতে যাবি? যাবি? পারুল একবার অতি মৃদু ডাকিয়া, ল্যাজ একটু নাড়িয়া আবার বেশ আরামের সহিত কোলে মুখ গুঁজিয়া পড়িল। সুধা নিজের ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের দিকে একটু বিষণ্ণভাবে চাহিল; পথ দিয়া একদল ছোট ছেলেমেয়ে নানা রংএর সিল্কের পোষাক পরিয়া হাসিয়া নাচিয়া যাইতেছে; পারুলের কাণ দুটি নাড়িয়া সে বলিল, এ ময়লা কাপড় পরে আর ঠাকুর দেখতে যায় না, নয় পারুল? পারুল কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া আরামের সহিত কোলে অর্দ্ধচন্দ্রের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া রহিল দেখিয়া সুধা

খোকাকে বুকে তুলিয়া চুমো দিতে লাগিল ; অগ্নি পারুল কোলের কাপড় হইতে মুখ তুলিয়া একটু ঘাড় বাঁকাইয়া সুধার দিকে চাহিল। সুধা হাসিয়া বলিল, অ, হিংসেয় অগ্নি জ্বলে গেলেন! কেন, এতক্ষণ কথা কইছিলুম, উত্তর দিচ্ছিলি না! পারুল ঘাড় একটু নত করিয়া ব্যথিত নয়নে সুধার দিকে চাহিল, সুধা তাহাকে এক হাত দিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইল। সহসা সিঁড়িতে পায়ের শব্দে সে চমকিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি পারুলকে কোল হইতে নামাইয়া দূরে রাখিয়া দিল, কিন্তু সম্মুখে বাড়ীর গৃহিণীর বিপুল কায়া দেখিয়া পারুল সুধার গা ঘেসিয়া বসিল।

স্থূলকায়া গিন্নি সিঁড়িটুকু উঠিতেই শ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সুধার দিকে একখানা শাড়ী ছুড়িয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, হাঁরে সুধি, আমি কি তোর ইয়াব, আমাব সঙ্গে ঠাট্টা ; বল্লুম, তেলের শিশি নিয়ে আয়, দিয়ে গেলি তরল আলতার শিশি, আমি মেখে মরি। হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি সুধার পাশে সিঁড়িতে বসিয়া পড়িলেন। সুধা তাড়াতাড়ি পাশ হইতে পারুলকে তুলিয়া জানালার কোণে রাখিল, গিন্নির দেহের চাপে তাহার প্রাণসংশয় হইতে পারে। অবাক্ হইয়া সে বলিল, আমি কি জানি জেঠাইমা, তেলের শিশিগুলার মধ্যেইত ওটা ছিল। ছোট বৌমা যে ভুল করিয়া এ শিশি দিয়াছিল, তাহা সে বলিল না। গিন্নি গালের পানটুকু চিবাইতে চিবাইতে বলিতে লাগিলেন, আবার মুখের উপর চোপরা—খোকা ঘুমল—এখনও ঘুমায় নি—কি হচ্ছিল, বেড়ালকে সোহাগ—কোন্ দিন ছেলেকে আঁচড়ে দেবে—ওটা না মরলে আমার শান্তি নেই—সে খোকাকে।

সুধা খোকাকে গিন্নির কোলে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গিন্নি সিঁড়ির ওপর কাপড়খানির দিকে দেখাইয়া বলিলেন, যা, নে কাপড়খানা তুলে, এই তোর পূজার কাপড়, যা' কাপড় পরে ওদের সঙ্গে ঠাকুর দেখে আয়—তুলে নে—হাঁ করে রইলি কেন, আমার জর্দ্দার শিশিটা কোথায়, দিয়ে যা—

সুধার বয়স সাত হইলেও এই বয়সেই সংসার সম্বন্ধে তাহার অনেক অভিজ্ঞতা হইয়াছে। শাড়ীখানি যে পুরাতন, তাহা সে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। এ শাড়ীখানি যে গৃহিণীর ছোট মেয়েকে পরিতেও দেখিয়াছে! সে ধীরে বলিল, আমি ঠাকুর দেখতে যাব না।

যাব না! কেন শুনি—আদিক্ষ্যেতা রাখ্ নে ধর, বলিয়া গিন্নি শাড়ীখানি সুধার দিকে ধরিলেন। সুধা কাপড় হাতে লইল বটে, কিন্তু আপনাকে দমন করিতে পারিল না, ক্ষুব্ধ ভাবে বলিয়া উঠিল, আমি কাপড় চাই না।

চাই না! কেন? ও! কি লাটবেলাটের মেয়ে এলেন, ওর জন্যে বারাণসীর জোড় নিয়ে এস—আরে বাবু আমার স্বর্ণ মোটে একটিবার ওটি পরেছিল—যা শীগ্‌গীর, ওরা দাঁড়িয়ে আছে, এসে আমার পা আর পিঠ মালিশ করে দিবি—

গিন্নি এই তেজস্বিনী মেয়েটিকে জানিতেন। মা-হারা অনাথিনী হইলেও, তাহার আত্মসম্মানবোধ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কাহারও কাছে অপমান সহ্য করে নাই। কাপড় ধরিয়া গোঁ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া গিন্নি ধীরে বলিলেন, আচ্ছা মা, আজ ওইটা পরে যাও, ছোট বৌ তোমার জন্যে একটা নতুন

ভাল শাড়ী আনতে দিয়েছে, কাল পাবে ; এটা আবার চাইছে দেখ—কি অলুক্ষুণে বেড়াল—

পারুল সত্যই খুব রাগিয়া কটমট করিয়া গিন্নির দিকে চাহিয়াছিল, ওই বিপুল শুভ্র দেহ নখ দিয়া আঁচড়াইতে পারিলে যেন তাহার শান্তি হয়। সে কর্কশভাবে ডাকিয়া উঠিল। আ মর, বলিয়া গিন্নি অর্দ্ধভুক্ত ভুট্টাটা সজোরে ছুঁড়িয়া তাহাকে মারিলেন। পারুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, সুধা তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে তুলিয়া কাপড় লইয়া চলিয়া গেল। গিন্নি খোকার ননীর মত নরম গালে এক ঠোনা দিয়া বলিলেন ঘুমো শীগ্‌গীর—ওকে কোলে নিয়ে আমি বসে থাকি, কত কাজ পড়ে আছে,—অ, রাঁধুনী বামুণীর মেয়ে, তার দেমাক দেখ, তবু যদি সাত কুলে কেউ থাকত—ঘুমো।

সুধা কিন্তু কাপড় পরিয়া ঠাকুর দেখিতে গেল না। সে পারুলকে লইয়া ছাদের এক কোণে গিয়া বসিল। শাড়ীখানি পারুলের গায়ে গায়ে ছুঁড়িয়া মারিয়া বলিল, নে পারুল নে, কাপড়খানা তুই ছিঁড়ে ফেল—পরব না—আমি পরব না।

পারুল ত তাই চায়। গিন্নির ওপর সকল আক্রোশ সে শাড়ীখানির ওপর মিটাইবার জন্য শাড়ীখানির ওপর লাফাইয়া পড়িয়া নখ দিয়া কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িতে আরম্ভ করিল। ওমা, সত্যি পারুল ছিঁড়চিস, বলিয়া সুধা পারুলকে শাড়ী হইতে ঠেলিয়া দিল। পারুল লজ্জিত ক্ষুব্ধভাবে শাড়ীখানি পা দিয়া ঠেলিয়া শিকারের সম্মুখে বাঘের মত থাবা মেলিয়া বসিল।

ওমা, কি রকম রেগে বসেছে, আয় পারুল আয়, বলিয়া

সুধা হাসিয়া তাহাকে কাছে আনিতে গেল। পারুল সকল আদর উপেক্ষা করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল। পারুল, শাড়ী পরবি, বলিয়া সুধা ছেঁড়া শাড়ীটা খুলিয়া পারুলের দেহে জড়াইয়া বলিল, দেখ্ কি সুন্দর তোকে মানাচ্ছে। পারুল অতি বিরক্তির সহিত গা ঝাড়িয়া শাড়ীর বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া গম্ভীর মুখে সরিয়া বসিল। সুধা পারুলের কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া বলিল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে পারুল, খাবি এখন— এই কথাগুলি বলিলেই পারুল সজাগ হইয়া ওঠে। কিন্তু এ বাক্যবাণও ব্যর্থ হইল। পারুল একবার করুণ নয়নে সুধার দিকে তাকাইয়া গোঁ হইয়া বসিয়া রহিল। সুধাও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মন কি অজানা ব্যথায় ভারী হইয়া উঠিতে লাগিল। শুক্লাষ্টমীর চন্দ্র নারিকেল গাছের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছে। চাঁদের দিকে চাহিয়া তাহার মাকে মনে পড়িল। গত বছর পূজায় তাহার মা কি সুন্দর ডুরে শাড়ী দিয়াছিলেন। মাগো, বলিয়া আঁচলে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। পারুল ধীরে তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া ছলছল চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কাঁদিতে সুধার ভাল লাগিত না। এ সংসারে সে মাতৃহীনা অনাথিনী বালিকা, তাহাকে কত দুঃখ নির্য্যাতন অপমান সহিতে হয়, সে কত কাঁদিবে? তাহার বিধবা মা এ সংসারে রাঁধুনী ছিলেন। তিনি মারা যাবার পর তাহার আর কেউ নেই বলিয়া এসংসারে সে আছে। গিন্নির ফরমাস খাটা, ছোট ছেলেমেয়েদের দেখা, খোকাকে দুধ খাওয়ান, ঘুমপাড়ান ইত্যাদি নানা কাজ

তাহাকে করিতে হয়। ছোট ঝির মত সে আছে, তাহার কাঁদিয়া কি হইবে?

চোখ মুছিয়া পারুলের ছলছল মুখ দেখিয়া সুধা ধমক দিল—পারুল কাঁদবি না। তারপর তাহাকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুধা নীচে কাজে নামিয়া গেলে, পারুল কিছুক্ষণ ছাদের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কোন অজানা আক্রোশের ব্যথায় সে যেন ফুলিতেছিল, ওই ছেঁড়া শাড়ীটা নখ দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দিতে পারিলে যেন তাহার শান্তি হয়। কিন্তু শাড়ীটা সে রাগের চোটে সত্যই ছিঁড়িয়াছে ভাবিয়া একটু লজ্জিত হইয়া পা দিয়া শাড়ীটা ঠেলিয়া সে ছাদ হইতে রাস্তায় লাফাইয়া পড়িল। পথে কত ছোট ছেলেমেয়েরা কত রং-বেরংএর সাজ পরিয়া, পাউডার মাখিয়া, এসেন্স মাখিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। সুধার ব্যথিত মলিন মুখ, তাহার ময়লা ছেঁড়া কাপড় বারবার পারুলের মনে পড়িতে লাগিল; রাগে চোখ জ্বলজ্বল করিয়া চাহিতে চাহিতে সে চলিল।

গলির মোড়ে এক প্রকাণ্ড অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা আছে, তাহার বিজন জীর্ণ অন্ধকার ঘরগুলিই তাহার প্রধান আড্ডা। যখনই তাহার মন খারাপ হইত, সে এই জীর্ণ প্রাসাদে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, আর ইঁদুর সম্মুখে মিলিলে শিকার করিত। আজ সন্ধ্যায় সেই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে অবাক হইয়া

দাঁড়াইল। সেই প্রকাণ্ড তিনমহল প্রাসাদের এক কোণে তিনটি ঘর জুড়িয়া দুইটি প্রাণী বাস করে—এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধা। বাকী সব ঘর জীর্ণ, পরিত্যক্ত, অন্ধকার। আজ সে বাড়ী আলোকে জ্বল জ্বল করিতেছে, ঘরে ঘরে লোকের কোলাহল। তাহার চিরপরিচিত ভাঙা জানালার পথ দিয়া ঢুকিতে যাইয়া দেখিল, সে ঘরে প্রকাণ্ড উনান পাড়িয়া বামুনেরা বৃহৎ কড়ায় লুচি ভাজিতেছে। সে পথ দিয়া ঢোকা হইল না। ঘুরিয়া এক দেওয়ালের গর্ত্ত দিয়া সে বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। একটা থামের আড়ালে অন্ধকার কোণ হইতে দেখিতে লাগিল, প্রকাণ্ড আঙ্গিনা জুড়িয়া দলে দলে ছোট ছেলেমেয়েরা সাজিয়া খাইতে বসিয়াছে; বামুনেরা লুচি, পোলাও, মাংস—কত কি পরিবেশন করিতেছে। আর যে বুড়াকে কত সময় পেঁচার মত মুখ করিয়া চাবির থোলো ট্যাঁকে গুঁজিয়া কাসিতে কাসিতে ভূতের মত এই বাড়ীতে ঘুরিতে দেখিয়াছে, সে তাহার পেচকবদন যথাসম্ভব আনন্দোজ্জ্বল করিয়া সবাইকার খাওয়া তদারক ক'রিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা পারুলের কাছে স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। পারুলের চোখ দুইটি সর্ব্বদাই যেন ঘুমে ভরা থাকে। অতি অলসভাবে সে সব জিনিষ দেখে। তাহার চোখ দুইটি জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, মনোযোগ দিয়া সে সব দেখিতে লাগিল। সব পাত ছেলেমেয়েতে ভরা, শুধু ঠিক তাহার সম্মুখের সারির মাঝের একখানি পাত খালি। পাতের সম্মুখে কুশাসন নয়, এক সুন্দর গালিচার আসনের ওপর কয়েকখানি লাল কাপড় জামা ঝকমক করিতেছে। পাতে কেহ বসে নাই বটে, কিন্তু এক বড় সোনার থালে লুচি পোলাও

খুব বেশী করিয়া সাজান ; তাহার চারিদিকে ঘেরিয়া মাছ, মাংস, তরকারী-ভরা সোনার বাটিগুলি ঝকমক করিতেছে। সে যে থামের আড়ালে আশ্রয় লইয়াছিল ঠিক তাহারই সম্মুখে পাতটি।

নিঃশব্দে সন্তর্পণে পারুল থামের আড়াল হইতে বাহির হইয়া পাতটির দিকে অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু সে সারির ছোট মেয়েদের চোখ এড়াইতে পারিল না। 'ওরে বেড়াল'—'কি সুন্দর সাদা ভাই'—'খেতে বসেছে দেখ কি ভঙ্গী করে, যেন ওরও নেমন্তন্ন হয়েছে।'

কিন্তু তাহারা খাওয়ার গল্পে এত বিভোর ছিল যে, বেড়ালটিকে তাড়াইয়া দিবার কথা মনে হয় নাই, সেও যেন তাহাদের সহিত নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়াছে। পারুল কিন্তু আসনের পাশে আসিয়া খাবারের দিকে চোখ দেয় নাই ; সম্মুখে মাছের মুড়োটা তাহাকে লুব্ধ করিতেছিল বটে, কিন্তু সে আসনের উপর লাল টুকটুকে সিল্কের শাড়ীখানি কিরূপে লইবে, তাহাই ভাবিতেছিল। শাড়ীখানি থাবা দিয়া ধরিয়া মুড়িয়া ছোট করিয়া দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরিতে ধরিতে পারুল চমকিয়া উঠিল, সেই বুড়োটা চোখ ঠিকরাইয়া হুঙ্কার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে,—ওরে হতভাগা—লক্ষ্মীছাড়া—ওই ওই পাতে—অলুক্ষুণে—কি করছিস্ মেয়েগুলো—গিলছে—তাড়া দে—নচ্ছার—!

কাপড় লওয়া হইল না বটে, কিন্তু পারুল পলাইল না। সে সম্মুখের ছোট মেয়েদের গায়ে লাফাইয়া পড়িল।

মাগো, বলিয়া তাহারা লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহারা দাঁড়াইতে আর সবাই পারুলের ছুটাছুটিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। রান্নাঘর হইতে বামুনেরা ছুটিয়া আসিল, দেউড়ী হইতে দরওয়ানেরা ছুটিয়া আসিল, কত জলের গেলাস পড়িল, কত মেয়ে আছাড় খাইল; এই গোলমালের সুযোগে পারুল ধীরে শাড়ীটি মুড়িয়া মুখে পুরিয়া ছুট দিল। বুড়ো জামাকাপড়ের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল বটে, কিন্তু বেড়ালটা দূরে আছে ভাবিয়া সেদিকে দেখে নাই। যখন পারুল তাহার পায়ের পাশ দিয়া চলিয়া গেল, তাহার খেয়াল হইল, কিন্তু পারুলকে তাড়া করিতে গিয়া সে একটি ছোট মেয়ের ঘাড়ে পড়িল; তাহাকে সরাইয়া ছুটিতে যাইতে তাহার কাসির বেগ আসিল, কাসিতে কাসিতে হাতের চাবির থোলোটা সজোরে পারুলের দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল। চাবির থোলো পারুলের পিছনে গিয়া লাগিল, ক্ষণিকের জন্য সে যন্ত্রণায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তারপর আঙ্গিনায় দেউড়ীতে রক্তের ফোঁটা ফেলিতে ফেলিতে সে শাড়ীমুখে সদর দরজা দিয়া পথের অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল।

যাহার বাড়ী হইতে পারুল শাড়ী লইয়া পলাইল, সেই ধনপতি সেকরার নাম পাড়ায় সবাই জানে। তাহার নাম হইলেই কেহ বলে 'আহা', কেহ বলে 'উহু'। তাহার শীর্ণ দেহ, বার্দ্ধক্য-

রেখাঙ্কিত স্বর্ণবুভুক্ষু মুখ, তাহার তীক্ষ্ণ হিংস্র দৃষ্টি, রুক্ষ মেজাজ, তাহার নির্দ্দয়তা, স্বার্থপরতা দেখিলে মনে হয় না, একদিন ও-লোকটা হাসিয়াছে, আমোদ করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে। কিন্তু একদিন এই বৃহৎ সুসজ্জিত প্রাসাদে আলো জ্বালাইয়া, ফুলের মালা দোলাইয়া, নহবৎ বসাইয়া শাঁক বাজাইয়া সোনায় মুড়িয়া সে তাহার তিন মেয়েকে বিবাহ দিয়াছে, সোনায় মুড়িয়া তাহার দুই ছেলের বৌকে ঘরে তুলিয়াছে; এই বাড়ীতে আনন্দের বন্যা বহিয়াছে, এই ঘরে ঘরে সে তাহার চার নাতির সহিত ছুটোছুটি করিয়াছে, হাসিয়াছে, গল্প করিয়াছে, তাহার প্রিয়তম নাতিনীকে কোলে করিয়া দুর্গোৎসব করিয়াছে। একসঙ্গে দুজনে অষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছে, নতজানু হইয়া দেবীকে প্রণাম করিয়াছে। একে একে তাহার বংশের সকল প্রদীপই নিভিয়া গিয়াছে; এখন এই বৃহৎ জীর্ণ অট্টালিকায় সে ও তাহার নিঃসন্তান বিধবা বোন বাস করে। ধনপতির গত জীবনের সুখের ইতিহাস যাহারা জানে, তাহারা বলে 'আহা!'

সংসার যখন তাহার কাছে শূন্য হইল, স্বর্ণ তাহাকে মোহগ্রস্ত করিল, অর্থের লালসায় মত্ত হইয়া সে দিনরাত দোকানের কাজে মাতিল। যাহারা তাহাকে সুদখোর মহাজন, কঞ্জুষ অর্থপিশাচ-রূপে জানে, তাহারা তাহার নাম হইলে বলে 'উহুঁ'। কিন্তু এই অর্থ-পিশাচের অন্তরের সোনার মরুভূমিতে একটি সুকোমল পুষ্প চির-অম্লান ফুটিয়া আছে, একটি স্নিগ্ধ স্নেহধারাকে এই অগ্নিজ্বালায় সর্ব্বগ্রাসী স্বর্ণ-স্তূপ গ্রাস করিতে পারে নাই—সেটি

তাহার স্নেহের নাতনীর স্মৃতি। এই একমাত্র নাতনী তাহার বংশের শেষ প্রদীপ ছিল; জাহাজ-ডুবি হইলে নাবিক যেমন একটুকু ভাঙা মাস্তল পাইলে আঁকড়াইয়া থাকে, তেমনি ধনপতি এই নাতনীকে জড়াইয়া শূন্য সংসারে পাড়ি দিতে চাহিয়াছিল। সে স্নেহতরীও ডুবিয়া গেল; পাঁচ বছর আগে একরাতের কলেরার আক্রমণে এক শরতের সোনার উষায় ছিন্ন মলিন শেফালির মত সে ঝরিয়া পড়িল। তাহাকে স্মরণ করিয়া ধনপতি প্রতি বৎসর পূজার সময় পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়। এই একটি দিন অর্থ-পিশাচ স্বর্ণকার মানুষটি ঠাকুর্দ্দার ব্যথার স্নেহের সাগরে ডুবিয়া যায়।

রাত্রি গভীর হইয়াছে। শারদীয় শুক্লা ষষ্ঠীর চন্দ্র হইতে সুন্দর জ্যোৎস্না ঝরিয়া পরিতেছে, স্নেহময়ী মায়ের চাউনির মত। ধনপতির ঘরে কিন্তু একটুও জ্যোৎস্না প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার বৃহৎ ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। সেই ঘরের মধ্যে মোটা-মোটা লোহার গরাদে দেওয়া ছোট ঘর। সেই লোহার খাঁচায় তিন বৃহৎ সিন্দুকের পাশে পিতামহের আমলের খাটে ধনপতির মলিন শয্যা।

বিছানায় বসিয়া ধনপতি সিন্দুকের দিকে চাহিয়া ছিল; স্বর্ণলুব্ধ চোখ দুইটি স্নেহের কজ্জলে আজ স্নিগ্ধ হইয়াছে। সিন্দুকের ওপর নাতনীকে উৎসর্গ-করা কাপড় জামাগুলি সাজান। একটা শাড়ী বেড়ালে লইয়া গিয়াছে, তার জন্য প্রথম তাহার বড় রাগ হইয়াছিল; কিন্তু এখন বেড়ালটাকে মারার জন্য দুঃখ হইতেছিল, একটা শাড়ী, তার জন্য আজ রক্তপাত না করিলেই

হইত। ধীরে সে উঠিয়া একটি সিন্দুক খুলিল। নানা রংএর সিল্কের শাড়ী ফ্রক, সিন্দুকের এক পাশে সাজান গত ছয় বৎসরের পূজার কাপড়-জামা। সিন্দুকের আর একদিক হইতে কোম্পানীর কাগজ, হ্যাণ্ডনোট, সোনার গয়নার স্তূপের মধ্য হইতে ধনপতি সোনার কাজ-করা মখমলের একটি ছোট চটি বাহির করিল; কোণে একটি জায়গায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এই চটিটি পরিয়া তাহার নাতনী ওই ঘরে হাসিয়া ঘুরিত, এই ফুটো দিয়া তাহার কচি পায়ের সুন্দর আঙ্গুল দেখা যাইত। ধীরে সে সেই চটির ছেঁড়া অংশ আদর করিল। সহসা সে চমকিয়া উঠিল, কচি মিষ্টি পায়ের শব্দ কাণে আসিতেছে, ঠিক তাহার নাতনীর পায়ের শব্দের মত। অনেক সময় তাহার এরূপ মনের ভুল হইয়াছে; কত সন্ধ্যাবেলা এই কচি পায়ের শব্দের আলেয়ার পেছন পেছন সে এই ভাঙা বাড়ীর ঘরের অন্ধকারে ঘুরিয়াছে, তাহার নাতনীর ছায়া তাহার চোখে ঝলক দিয়া কোথায় নিমেষে লুকাইয়াছে; সে পায়ের ধ্বনি যে অলীক মায়া তাহা সে বারবার বুঝিয়াও ঘুরিয়াছে; কিন্তু সে ধ্বনি ত কখনও এরূপ স্পষ্ট এরূপ দৃঢ় হয় নাই। তাহার স্নেহ-মণ্ডিত-মুখ সহসা কঠোর, শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহার সিন্দুকগুলির ওপর সহরের সকল চোর ডাকাতের দৃষ্টি আছে; তাড়াতাড়ি সিন্দুক বন্ধ করিবে, না দরজা বন্ধ করিবে ভাবিতেছে, দেখিল, দরজার গোড়ায় একটি ছোট মেয়ে। ধনপতি আবার চমকিয়া উঠিল; ঠিক তাহার নাতনীর মত মুখ, করুণ সুন্দর আভামণ্ডিত, তাহারি মত উজ্জ্বল দৃষ্টি, তাহারই মত দাঁড়াইবার ভঙ্গী।

কিন্তু মেয়েটি যখন কাঠের দরজা পার হইয়া লোহার দরজার সম্মুখে আসিল, সে নির্ণিমেষ নয়নে মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। লোহার দরজা পার হইতে সুধার ভয় করিল; সে গরাদে ধরিয়া বলিল, আমার বেড়াল কি তোমার এই কাপড় নিয়ে গেছে? বেড়াল, শাড়ী এ সবের প্রতি ধনপতির এতক্ষণ লক্ষ্যই হয় নাই। সে কিছু না বলিয়া একটু ঘাড় নাড়িয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সুধা কাপড়খানি বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, ওই নাও তোমার কাপড়, তুমি আমার বেড়ালকে এমন মেরেছ কেন? ভারি কাপড়!

ষাট বছরের বৃদ্ধ অতি লজ্জিত করুণভাবে এই সাত বছরের মেয়েটির দিকে চাহিল, তাহার মলিন বাসের প্রতি চোখ পড়িল, ধীরে বলিল, তুমি শাড়ীখানি নিয়ে যাও।

না আমি চাই না, তুমি এমন মেরেছ, ও খোঁড়া হয়ে গেছে, বলিয়া সুধা পারুলের নেকড়া-জড়ান আহত পায়ের ওপর হাত বুলাইল। সে তাহার কোলেই ছিল।

শোন, তুমি এ কাপড় নিয়ে যাও, তুমি বুঝি আজ খেতে আস নি!

আমি চাই না কাপড়, চাই না খেতে।

মুগ্ধনয়নে ধনপতি সে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার নাতনী ব্যথায় অভিমান করিলে তাহার মুখ অম্নি রাঙা হইয়া উঠিত।

নাতনীর স্বপ্ন-ছবি হারাইয়া গেল, পায়ের করুণ শব্দ

ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল; ধনপতি বেদনায় শ্রান্ত হইয়া শয্যায় শাড়ীর পাশে শুইয়া পড়িল।

মাঝ-রাতে ধনপতির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল, হায় কি হইল! সে যে স্বপ্ন দেখিতেছিল, সে আট বছরের ছেলে, লাল জড়ি-পাড়ের কোঁচান দেশী ধুতি পরিয়াছে, সিল্কের পাঞ্জাবী পরিয়াছে, মখমলের পাম্পস্থ পরিয়াছে, আতর মাখিয়াছে, তাহার নাতনীর মত একটি ছোট মেয়ের হাত ধরিয়া পাড়ায় পাড়ায় প্রতিমা দেখিয়া ঘুরিতেছে; তাহার মা তাহাকে যে একটা টাকা দিয়াছেন, তাহার আট আনা সে মেয়েটির জন্য খরচ করিয়া ফেলিল, তাহাকে কাকাতুয়া বেলুন লজনচুষ কত কি কিনিয়া দিল! সে কি খাওয়ার সুখ! সে কি দেবার আনন্দ! সে কি সাজ-সজ্জা করার আমোদ!

সে ত আট বছরের নয়, সে যে ষাট বছরের! মাথার গোড়ায় প্রদীপ নিবু-নিবু হইয়া ভূতের মত দীর্ঘ ছায়া দেওয়ালে নাচিতেছে, কিন্তু ওই কোণে কে দাঁড়াইয়া? সেই মেয়েটি বেড়াল কোলে করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে! তাহাকে কেহ পূজায় কাপড় দেয় নাই! পুতুল সন্দেশ দেয় নাই! চমকিয়া ধনপতি উঠিয়া বসিল। সহসা সিন্দুকের প্রতি চোখ পড়িতে সে চেঁচাইয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ! প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া ঘরটি ভাল করিয়া দেখিল, সে সিন্দুক খুলিয়া দরজা খুলিয়া শুইয়াছে। এমন কাণ্ড তাহার জীবনে কখনও হয় নাই। সিন্দুকে চাবি দিল, দরজায় চাবি দিল; তারপর ঘরে ঘুরিতে ঘুরিতে

আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, নিজের শীর্ণজীর্ণ মুর্ত্তির প্রতি ব্যথিত করুণ নয়নে চাহিয়া রহিল, তার আট বৎসর বয়সের কোমল সুন্দর দেহের স্বপ্ন-ছবি চোখে ভাসিয়া উঠিল, সেই উপহার দেওয়ার আনন্দ, খাওয়ার খাওয়ানোর আনন্দ, ভাল জামাকাপড় পরার আনন্দ, সেই সহজ সরল সুখগুলি আর জীবনে ফিরিয়া আসিবে না? বাকী রাতটুকু সে বন্ধ ঘরে ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইল। আজ তাহার চুল শণের মত সাদা, তাহার দেহ ঝরা-পাতার মত শুকনো, আজ সে খাইয়া পরিয়া ত কোন আনন্দ পায় না। যখন তাহার এক টাকা মাত্র সম্বল ছিল, সে আট আনা পয়সা খরচ করিয়া খেলনা কিনিয়া উপহার দিয়াছে!

পরদিন সকাল-দুপুর ধনপতি তাহার বৃহৎ প্রাসাদের শূন্য ভগ্ন গৃহগুলিতে ভূতের মত ঘুরিয়া কাটাইল। তাহার ষাট বছরের অর্থপিশাচ আনন্দহীন 'আমি'-টিকে আট বছরের সহজ সরল আনন্দময় 'আমি'র স্মৃতি ব্যথিত ও চঞ্চল করিয়া তুলিল। বিকেলে তাহার ইচ্ছা হইল, পথের ওই ছেলে-মেয়েদের মত সে নতুন কাপড় পরিবে, সাজিবে, আতর মাখিবে, বাঁশী বাজাইবে। সাজ-সজ্জা বিশেষ হইল না, ময়লা কাপড় ও গেঞ্জি পরিয়াই সে বাহির হইল। পথে সবাই দল বাঁধিয়া চলিয়াছে, কত ছেলেমেয়ে কত পুতুল খেলনা কিনিতেছে। সেও কিনিবে,—সোলার

সুন্দর এক কাকাতুয়া কিনিল, একটা লাল বেলুন কিনিল, একটা বাঁশী কিনিল, কিন্তু বাঁশী বাজাইতে পারিল না! পথের সবাই তাহার দিকে অবাক্ হইয়া দেখিতেছে, ধনপতি সেকরা খেলনা কিনিতেছে! কাহার জন্য? হায়, খেলনা কিনিয়া দিবে এমন তাহার কেহই নাই! কাহার হাত ধরিয়া আজ সে ঠাকুর দেখিতে যাইবে? কিছুক্ষণ বাঁশী, বেলুন, কাকাতুয়া হাতে করিয়া ঘুরিয়া সে নিজেই অবাক্ হইয়া যাইতেছিল, সে কি পাগল হইল! পথের কোন মেয়েকে এইগুলি দিয়া বোঝা হইতে মুক্ত হইবে ভাবিতেছে, সহসা অদূরে সুধাকে দেখিয়া ধনপতি সেইদিকে ছুটিল; কাল রাতে-দেখা সেই মেয়েটি একখানা লাল ডুরে পরিয়া কোলে বিড়াল লইয়া চলিয়াছে। তাহার দিকে বুড়ো বেগে আসিতেছে দেখিয়া সুধা বিরক্তির সহিত অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, কিন্তু বুড়ো তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে একটু অবাক্ হইয়া তাহার হাতের কাকাতুয়া বেলুন বাঁশীর প্রতি চাহিল। সুধার দেখার ভঙ্গীতে একটু অপ্রস্তুত হইয়া ধনপতি ধীরে বলিল, খুকি, এগুলো নেবে?

আমি কেন নিতে যাব?

নাও, আমি তোমায় দিচ্ছি।

না, আমি নেব না, কাল তুমি আমার বেড়ালকে মেরেছিলে—

বুড়োমানুষ দিদি, রাগের মাথায় মেরেছি।

না, পথ ছাড়, আমার মোটে একঘণ্টা ছুটি।

মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে একটু অগ্রসর হইয়া সুধা মুখ ফিরাইয়া দেখিল, বুড়ো ছলছল চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। ধনপতির

ব্যথিত মুখ, পুতুলগুলি ধরার ভঙ্গী, ক্লান্তকরুণ চাউনি দেখিয়া সুধার মনে একটু দুঃখ হইল। সে দাঁড়াইয়া বলিল, তুমি কাঁদছ কেন? তোমায় আমি কি বলেছি?

তুমি নিলে না এগুলো?

সত্যি দেবে? নিবি পারুল?

বুড়োর ওপর পারুলের রাগ থাকিলেও, তাহার নিকট হইতে খেলনা লইতে তাহার আপত্তি ছিল না। সে ঘাড়টি লম্বা করিয়া একটু লেজ নাড়িল।

আচ্ছা দাও, বলিয়া সুধা স্নিগ্ধমুখে ধনপতির দিকে চাহিল। বৃদ্ধ তাহার হাতে প্রথমে লাল বেলুনটি দিল। বেলুনের সুতা পারুলের পায়ে জড়াইয়া সুধা বলিল, কিন্তু এতগুলো কি করে নেব?

আচ্ছা দিদি, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

ও, আমি অনেকদূর যাব, সেই মিত্তিরদের বাড়ী ঠাকুর দেখতে।

বেশ, বেশ, আমিও যাব।

বুড়োটি সুধার কাছে এক বেদনাময় রহস্যের মত বোধ হইতে লাগিল; তাহার ব্যথিত মুখ, অসহায় সঙ্গীহীন অবস্থা দেখিয়া তাহার করুণা হইল; বজ্রদীর্ণ ভূপতিত বৃহৎ বটবৃক্ষের জন্য পাশের সদ্যপ্রস্ফুটিত শেফালি ফুল যেমন ব্যথা বোধ করে; সেও তেমি ব্যথা বোধ করিতে লাগিল।

আচ্ছা এস, বলিয়া সে বুড়োর পাশে ধীরে ধীরে চলিল। একটু দূর অগ্রসর হইয়া ধনপতি একখানি গাড়ী ডাকিয়া সুধাকে

উঠাইল; শুধু মিত্তিরদের বাড়ী নয়, অনেক বড় বড় বাড়ীর প্রতিমা দেখিয়া আসিবার সময় ধনপতি সুধার জন্য একখানি বাণারসী শাড়ী ও খাবার কিনিয়া দিল। তাহার সকরুণ স্নেহময় অনুরোধে সুধা কোন আপত্তি করিতে পারিল না।

গাড়ী হইতে সুধাকে বাড়ীর সম্মুখে নামাইয়া দিয়া ধনপতি বলিল, আমি তোমার বুড়োদাদা হই, বুঝলে দিদি। যদি কেউ বলে, এসব কে দিয়েছে, বলবে মোড়ের ওই বুড়োদাদা। কাল আবার সন্ধ্যেবেলায় বেড়াতে যাব, কেমন?

সুধা উপহার-ভারাক্রান্ত হইয়া হাসিমুখে গাড়ী হইতে নামিল বটে, কিন্তু বাড়ীতে ঢুকিয়াই তাহার ভয় হইল। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল, 'কোথায় গেছলি ভাই'—'কে ভাই ও বুড়ো'—'এসব কি জিনিষ ভাই'। খাবারের চেঙ্গারিটি তাহাদের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিয়া সে নিজের ঘরে তাহার মায়ের ছোট টিনের বাক্সে কাপড় খেলনাগুলি রাখিতে গেল। খেলনাগুলি বাক্সে রাখিয়া শাড়ী-খানি বারবার নাড়িয়া দেখিতেছে, স্বর্ণ আসিয়া খবর দিল মা ডাকছেন। শাড়ীখানি বাক্সে রাখিতে গেলে স্বর্ণ বলিল, কাপড় শুদ্ধু এস, শীগ্গীর।

শাড়ীখানি হাতে করিয়া লজ্জিতভাবে সুধা গিন্নির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গিন্নি শাড়ীখানি হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, এই যে নবাবপুত্রীর বেড়ান হল। বলি কোন্ শ্বশুর দিয়েছে রে, এত খাবার, এমন কাপড়—

সুধা লজ্জিতভাবে বলিল, ওই মোড়ের বুড়োদাদা—

ওমা, এর মধ্যে আবার বুড়োদাদা পাতান হয়ে গেছে। স্বর্ণ, নিয়ে আয় ত আলোটা কাছে, দেখি শাড়ীখান্।

স্বর্ণ টিপ্পনী দিল, হাঁ মা, আমরা দেখলুম ওই যে মোড়ে বুড়ো সেকরাটা আছে না, তার গাড়ী থেকে সুধাদি নামল।

চুপ কর স্বর্ণ, বল কে দিলে শুনি ?

বল্লুম ত বুড়োদাদা।

বুড়োদাদা কে ?

ওই যে মোড়ে বড় ভাঙ্গা বাড়ী, তার পাশে তার সোনার দোকান।

কে, ধনপতি সেকরা ?

হাঁ।

হাসাসনে সুধি, হাসাসনে, ধনপতি সেকরা তোকে কাপড় খাবার কিনে দিয়েছে ; বলে যার হাত দিয়ে পাই পয়সা গলে না, লোকের বাপ-মা মারা গেলেও সে তার এক পয়সা সুদ ছাড়ে না, সে তোকে—চুরি করে এনেছে কোথা থেকে—হতভাগী—আমার যে মাথা কাটা যাবে।

আমি চুরি করি নি, সে আমায় কিনে দিয়েছে।

আবার চোপরা, বলিয়া গিন্নি হাতের পাখাটা সজোরে সুধার পিঠে ছুঁড়িয়া মারিলেন, বল, কোত্থেকে এনেছিস ?

ছোট বৌমা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি ধীরে বলিলেন, মা, আজ বছরকার দিন—

তুমি ত বল্লে বৌমা, বছরকার দিন, এদিকে যে মেয়ে

আমার চুরি করে এলো, আমরা যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

আমি চুরি করি নি, বুড়োদা—আমি কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে আসছি।

আবার তেজ দেখ, বল্লেই হল ধনপতি সেকরা দিয়েছে, আর আমি বিশ্বাস করব—ওরে অত সহজ নয়—বল্।

পারুল সুধার পাশে ঘুরিয়া এতক্ষণ রাগে ফোঁস্‌ফোঁস করিতেছিল, গিন্নি গর্জ্জন করিতে সেও দাত মুখ খেঁচাইয়া গর্জ্জন করিল।

ও বাবা, এও শাসন করতে আসে—অলুক্ষুণে—কামড়াবে নাকি রে, বলিয়া মেজে হইতে পাখাটা তুলিয়া গিন্নি সজোরে তাহার পিঠে বসাইয়া দিলেন।

কেন আমার বেড়ালকে মারছ ?

মারবে না! বেশ করব, মারব—তোর বাড়ী ?

পারুল যত দাঁত বাহির করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহার পিঠে পাখার ঘা ততই পড়িতে লাগিল।

ওমা আমার বেড়ালকে মেরে ফেল্লে গো, বলিয়া আহত পারুলকে কোলে তুলিয়া সুধা বলিল, চাই না থাকতে তোমার বাড়ীতে—চাই না—

চাই না! কোন্ চুলো আছে ?

আমি চাই না থাকতে—পারুল বড্ড মেরেছে ?

পারুলকে বুকে জড়াইয়া সুধা চলিয়া গেল। পানে জর্দ্দা পুরিতে পুরিতে গিন্নি বলিলেন, স্বর্ণ, কাপড়খানা রাখ

ত, দেখ 'ত বৌমা, মেয়েটা সত্যি আবার রাস্তায় বেরিয়ে না যায়।

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইত, কিন্তু হইল না। স্বর্ণ রিপোর্ট দিল শুধু শাড়ী নয়, সুধা আরও অনেক পুতুল খেলনা আনিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে গিন্নি সুধার ঘরে আসিয়া হাজির হইলেন। সুধা পারুলকে কোলে করিয়া আদর করিতেছিল। গিন্নি বলিলেন, সুধি, যা, নীচে গিয়ে খোকার ঝিনুক আর বাটি ধুয়ে দুধ নিয়ে আয়।

আমি পারব না।

পারব না! গিলতে পার!

আমি কি ঝি!

না রাজরাণী! ওঃ!

সুধা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল দেখিয়া গিন্নি বলিলেন, দেখি, আর কি সব পুতুল খেলনা এসেছে। সুধা গোঁ হইয়া বসিয়া রহিল। গিন্নি নিজেই তাহার ছোট বাক্স খুলিলেন, খেলনাগুলির পাশে তাঁহার দেওয়া পুরাতন শাড়ীখানি প্রথমেই চোখে পড়িল; তুলিয়া লইয়া দেখিলেন ছেঁড়া, কেহ ইচ্ছা করিয়া ছিঁড়িয়াছে। ক্রোধে জ্বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, কে ছিঁড়েছে কাপড়, কে?

ভীত লজ্জিতভাবে সুধা বলিল, পারুল খেলতে খেলতে—

খেলতে খেলতে—ওরে হতভাগী, বলি যার খাবি যার পরাবি—অত দামী কাপড়—পারুল—অলুক্ষুণে—দূর হ—

রাগিলে গিন্নির জ্ঞান থাকে না, তাঁহার মোটা দেহখানি

কাঁপাইয়া তিনি যে এবার কি করিবেন কেহ বুঝিতে পারিল না। সম্মুখে একটা লোহার ভাঙ্গা সিক পড়িয়া ছিল ; ক্রোধকম্পিত হস্তে তাহা তুলিয়া লইয়া পারুলকে এক খোঁচা দিলেন। আত্মরক্ষা করিবার জন্য অসহ্য বেদনায় গর্জ্জন করিয়া পারুল গিন্নিকে কামড়াইতে আসিল। গিন্নি সজোরে আর এক খোঁচা দিলেন।

ওগো, আমার বেড়াল মেরে ফেল্লে গো।

দূর হ—দূর হ—

দূর হচ্ছি, বলিয়া সুধা পারুলকে কোলে তুলিয়া বুকে জড়াইয়া নিমেষের মধ্যে ঘর ছাড়িয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সদর দরজা পার হইয়া পথের অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল।

ভোরবেলায় ধনপতির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহার সুসজ্জিত বৃহৎ বাড়ীতে পূজার ধূমধাম, বৈঠকখানার বন্ধুদের গল্প হাস্য, অন্দরমহলে কর্ম্মরতা বধূদের বলয়ধ্বনি, মৃদুগুঞ্জরণ, প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত লোকেরা খাইতে বসিয়া গিয়াছে, চারিদিকে ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি গোলমাল করিয়া খেলা করিতেছে, ঘরে ঘরে ঝাড় লণ্ঠন জ্বলিতেছে, নহবৎ বাজিতেছে। ধনপতি পূজার দালানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মায়ের কি অপরূপ রূপ !

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া চোখ মেলিতেই সে দেখিল, অন্ধকার, সব অন্ধকার, তাহার অন্ধকার বিজন স্তব্ধ লোহার শিকের ঘর। তাহার যেন দম আটকাইয়া যাইতেছে,

কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া লোহার দরজা খুলিয়া ধনপতি ভাঙা পূজার দালানের দিকে ছুটিল। ভোরের আলোয় পূজার দালান রহস্যময় মায়াপুরীর মত দেখাইতেছে।

দালানের যেখানে প্রতিমা স্থাপিত হইত, তাহারি সম্মুখে ধনপতি ছুটিয়া আসিল ; ভূমিষ্ঠ হইয়া মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিতেই সে চমকিয়া উঠিল, এ কি তাহার সম্মুখে ! এ কি আলো-অন্ধকারের মায়ালীলা? লাল কাপড়ের ওপর কালো চুল ঝিকমিক করিতেছে। একটু অগ্রসর হইয়া সে বিস্ময়ে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, মা, মা, এসেছিস— ফিরে এলি মা—

শূন্য ঘরে ঘরে সে আনন্দধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার শুদ্ধচারিণী বোন ঘরের দরজায় গোবরজল ছড়া দিয়া ঘুরিতেছিলেন ; তিনি আশ্চর্য্য হইয়া ছুটিয়া আসিলেন।

কি দাদা, কে মেয়ে শুয়ে? একটা বেড়াল! এ, মা! তাড়িয়ে দাও—আমি ওখানটা গোবর নেপে দি—

দেখ্ দেখ্ মা আমার ফিরে এসেছে—তুই বলছিলি আবার পূজা করতে—মা কি ভুলে থাকতে পারে? মা এসেছে—

দীপ্তমুখে আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে ধনপতি ঘুমন্ত সুধা ও পারুলকে কোলে তুলিয়া তাহার ঘরের দিকে চলিল।

বিজয়া-দশমীর সন্ধ্যা। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা প্রতিমাবিসর্জ্জন দেখিতে গিয়াছে। গিন্নি ছাদে খোকাকে কোলে করিয়া

বসিয়া সুধার কথা ভাবিতেছিলেন। মেয়েটাকে তিনি বকিতেন খাটাইতেন বটে, স্নেহও যথেষ্ট করিতেন। সে রাত্রে বিড়ালটাকে অত না মারিলেই হইত, কিন্তু বেড়ালটা তাঁর দুই চক্ষের বিষ; আর একটু মার খাইয়াছে বলিয়া ছোট মেয়ের অত কি রাগ, সে ত মরিয়া যায় নাই!

ধীরে সুধা আসিয়া গিন্নির দুই পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, জেঠাইমা আমি এসেছি।

সে একখানি লাল টুকটুকে শাড়ী পরিয়াছে, তাহার মুখ মলিন নয়, লক্ষ্মীঠাকুরণের মত সুন্দর, স্নিগ্ধোজ্জ্বল।

গিন্নি তাহার দিকে স্নেহের সহিত চাহিয়া বলিলেন, আয় মা, ছেলেমানুষ অত রাগ কি করে?

গিন্নির পাশে বসিয়া সুধা একটু লজ্জিতভাবে বলিল, দাও না জেঠাইমা খোকাকে আমার কোলে, ওর জন্যে আমার সমস্ত সময় মন কেমন করে।

খোকাকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে সুধা বলিল, হাঁ জেঠাইমা, আমার মা নাকি ওই বুড়োদাদার কোন্ বোনের মেয়ে?

হাঁ, সে আমি শুনেছি।

ও তাহলে সত্যি আমার দাদা? আমি তাহলে কোথায় থাকব জেঠাইমা?

সে তোমার যেখানে ইচ্ছে।

না, তুমি বলে দাও জেঠাইমা, আমি কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলুম না।

তা ওরা তোমার নিজের লোক, তুমি হলে ওদের নাতনী, সেখানে কত আদর যত্ন পাবে।

হাঁ জেঠাইমা, আমায় কিছুতেই ছাড়তে চায় না, কিন্তু তোমাদের জন্যে মন কেমন করে যে—আচ্ছা খোকাকে রোজ দেখতে আসতে পারব? পা-টা অমন করছ কেন, কামড়াচ্ছে বুঝি, মালিস করে দেব?

না, থাক্, তোকে ত বেশ সুন্দর কাপড় দিয়েছে।

চাকর আসিয়া খবর দিল এক বুড়াবাবু খুকীকে ডাকিতেছেন।

সুধা চঞ্চল হইয়া বলিল, বুড়োদা এসেছে, আমি বলে এসেছিলুম তিন মিনিটের মধ্যে আসব, তবে ছাড়লে! আমরা ভাসান দেখতে যাব কি না।

খোকাকে চুমো খাইয়া গিন্নির কোলে দিয়া গিন্নিকে প্রণাম করিয়া সুধা চঞ্চলপদে চলিয়া গেল। গিন্নির চোখ একটু ছলছল করিয়া উঠিল। তিনি খোকাকে বুকে জড়াইয়া চুমো খাইলেন।

সদর দরজা পর্য্যন্ত গিয়া সুধার মনে পড়িল, ছোট বৌদির সঙ্গে ত দেখা করা হয় নাই। আবার সে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ছোট বৌদির ঘরে গেল। ছোট বৌদি তাহাকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, সুধার চোখেও জল আসিল।

চাকর আসিয়া জানাইল বুড়াবাবু বড় ব্যস্ত হইতেছেন। ছোট বৌমা সুধার চোখ মুছাইয়া চুমো খাইয়া একটা মুক্তার মালা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, তোর বুড়োদার আর যে দেরী সইছে না।

রাঙা মুখে মুক্তার মালা হাতে জড়াইয়া সুধা বলিল,

পারুলের জন্যে দিলে ত! বৌদিকে প্রণাম করিয়া ছুটিতে ছুটিতে সে চলিয়া গেল।

গাড়ীতে কোলের কাছে সুধাকে টানিয়া ধনপতি বলিল, এত দেরী করে? জলদি হাঁকাও গাড়োয়ান।

আজ ধনপতির হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ সাজসজ্জা করিতে তাহার লজ্জা হয় নাই। সে লাল জরিপাড় ধুতি পরিয়াছে, সিল্কের পাঞ্জাবী পরিয়াছে, এসেন্স মাখিয়াছে, ষাট বছরের বৃদ্ধ আবার আট বছরের বালক হইয়াছে।

পারুল ধনপতির কোলে গম্ভীরভাবে বসিয়াছিল; ধনপতির গলায় যে সোনার সরু হার সর্ব্বদা থাকিত সেটি তার গলায় উঠিয়াছে, এই গর্ব্বসুখে সে দীপ্ত। সুধা তাহার গলায় মুক্তার হার জড়াইয়া দিলে সে সেদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করিল না। শুধু একটু নেজ নাড়িল।

আনন্দে অধীর হইয়া ধনপতি সুধার গালে চুমো খাইলেন! অম্নি পারুল চঞ্চল হইয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল। আ, হিংসেয় মরে যাচ্ছো, বলিয়া সুধা পারুলকে বুকে টানিয়া লইল!

সন ১৩২৯

সুরেশের মায়া

ব্যাপারটা আমি ঠিক বিশ্বাস করি না—আর যে বলেছে তার মনেও একটা সন্দেহ আছে—কিন্তু ব্যাপারটা যে হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সুরেশ ও তার স্ত্রীর দাম্পত্য-জীবন বাস্তবিকই সুন্দর ও মধুর ছিল। তাদের প্রেমের লীলা দেখে আমাদের আনন্দ হ'ত, একটু ঈর্ষাও হ'ত।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন ভাদ্রের ভরা নদী কোন্ অবসাদের মরুভূমিতে হারিয়ে গেল, বসন্তের রঙীন পুষ্প-বন মিলিয়ে গেল, অগ্নিতপ্ত তৃষ্ণাজ্বালাময় বালুচর জেগে উঠল।

একদিন শুনলুম সুরেশের স্ত্রী রাত এগারোটার সময় একটা পুঁটলী বেঁধে একখানা গাড়ী ডেকে তার বাপের বাড়ী চলে গেছে, আর পরদিন সুরেশ স্ত্রীর ট্রাঙ্ক আলমারি ড্রেসিং টেবিল গহনার বাক্স সব তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। একদিন দু'দিন একমাস দু'মাস কেটে গেল, সুরেশের স্ত্রী স্বামীর কাছে ফিরে এল না, সুরেশ ও তার কাছে একদিনও গেল না। এই অকস্মাৎ বিচ্ছেদে আমরা এত ব্যথিত হয়েছিলুম যে, সুরেশকে এ বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না, এটা তাদের দাম্পত্য-জীবনের একটা রহস্য রয়ে গেল।

এ বিচ্ছেদ-পর্ব্বের শেষে ছ'মাস পরে মিলনের পর্ব্বটা কিন্তু আরও আশ্চর্য্যকর আরও রহস্যময়। শুনলুম, কোন বিয়ে বাড়ীর নেমন্তন্ন খেয়ে সুরেশ রাত সাড়ে বারোটার সময় তার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে হাজির হয়েছিল, সেই গভীর রাতে দরজা ঠেলে চেঁচিয়ে বাড়ীর সবাইকে জাগিয়ে তার স্ত্রীকে বিছানা থেকে তুলে হাত ধরে গাড়ী করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসেছে। বাড়ীর মেয়েরা ভেবেছিল, তাদের জামাই বুঝি মাতাল হয়ে এসেছে, কিন্তু তার শ্বশুর কাউকে কোন বাধা দিতে দেন নি। তিনি বলেছিলেন, ও যদি আজ মায়াকে না নিয়ে যেতে পারে, ব্যথায় আত্মহত্যা করবে।

বিচ্ছেদের সময় সুরেশকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বেদনা বোধ হয়েছিল, কিন্তু যখন আবার আনন্দের মিলন হয়ে গেল, তাকে এক সন্ধ্যায় একা চা খেতে ডেকে ধরে বসলুম, ব্যাপারটা কি হয়েছিল বল। কেন তার গৃহলক্ষ্মী গৃহ ছেড়ে চলে গেছল, তা সে কিছু বল্লে না, কিন্তু কি করে তার হৃদয়-লক্ষ্মী হৃদয়ে ফিরে এল তার গল্প সে বল্লে। তার গল্পটা এই—

একটা বৌভাতের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিলুম। তুমি জান বিয়ে কি বৌভাতের কোন নেমন্তন্ন আমি বাদ দিই না, বিশেষতঃ বৌভাতের। এক নব-বিবাহিতা তরুণী তার পরিচিত প্রিয়জনের বাড়ী হতে আর এক অপরিচিত নব-প্রেমের সংসারে গিয়ে তার নতুন ঘরকন্না সুরু করবে, তার আনন্দ-মিলন উৎসবে যেতে আমার চিরদিনই বেশ ভাল লাগে, মনটা তাজা হয়ে উঠে, অন্তরের প্রেমটা আবার নবীন হয়। মায়া চলে যাবার পরে

আমি বাড়ী ছেড়ে বড় বেরুতুম না কিন্তু বৌভাতের নিমন্ত্রণগুলো বাদ দিই নি। মনটাকে জোর করে নিয়ে যেতুম।

এক বন্ধুর বৌভাতের নেমন্তন্ন খেয়ে অনেকদূর থেকে ফিরছিলুম। বন্ধুর বাড়ীটা প্রায় বালীগঞ্জ ষ্টেসনের কাছাকাছি, তাদের চালচলন সাহেবী। খাওয়াটা যদিও সকাল সকাল হয়েছিল, কিন্তু গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল, তারপর এক ফিটন গাড়ীতে একা বাড়ী ফিরছিলুম। আকাশের একদিকে সপ্তমীর চাঁদ উঠেছে, বাকী আকাশটুকুতে তারাগুলো ঝলমল করছে, দু'ধারে গাছের সারিতে অন্ধকার মায়াময় হয়ে উঠেছে, চারিদিক নিঝুম, শুধু ঘোড়ার খুরের একটানা খট্‌খট্ শব্দ। একা গাড়ীর এককোণে বসে একটানা চলেছি। বৌভাতের নেমন্তন্ন খেতে একা এম্নি চাঁদের আলোছায়াঘন নিস্তব্ধ রাত্রির মায়াময় পথ দিয়ে কখনও যদি বাড়ী ফিরে থাক, তবেই আমার মনের অবস্থাটা ঠিক বুঝবে।

সামনে পথ একটু দেখা যাচ্ছে, দু'ধারে অন্ধকার, গাড়ী চলেছে, চলেছে, যেন কোন্ নিরুদ্দেশে সারারাত চলবে—দেহ এলিয়ে পড়ে, মন ঝিমিয়ে আসে, চোখটা ধীরে ধীরে বুজে আসে, কিন্তু ঘুম আসে না। কারো শাড়ীর ঝলমলানি, হীরের কুচির মত কারো একটুকরো হাসি, বিদ্যুৎশিখার মত কারো কটাক্ষ, আগুনের আভার মত কারো মুখের দীপ্তি, কারো একটা কথা, কারো একটু চলার বা বসার ভঙ্গী—বিয়ে বাড়ীর কত রকম দৃশ্য চোখের সামনে অন্ধকারে ঝিক্‌মিক্ করে; রসুনচৌকি, হাঁকডাক হৈ-চৈ, হাসি—কত রকম শব্দের সুরে মাথাটা রিমঝিম করে;

ফুলের গন্ধ, লুচির গন্ধ, আতর গোলাপজলের গন্ধ—কত রকম গন্ধের স্মৃতিতে মনটা উস্‌খুস্‌ করে, মোহাবিষ্ট হয়। বেশ ভাল খেয়ে দেহটা যেমন তৃপ্ত, অনেক দেখে শুনে মনটা তেম্নি ভরপূর। বিয়ে বাড়ীতে আমি বর-কনেকে ভাল করে দেখি নি, বর-কনেকে যারা দেখতে যায় আমি তাদেরই ভাল করে দেখেছি। তাদের কেশের বেশের অলঙ্কারের দীপ্তিতে, হাসির কথার স্মৃতিতে মন ঝিলমিল করছে। বাহিরের ঝিল্লীরবে আকাশ ঝিমঝিম করছে, খট্‌খট্‌ শব্দে গাড়ী চলেছে, চলেছে।

সহসা একটু চমকে উঠলুম, মনে হল কে যেন আমার পাশে এসে বসল। চোখটা অলসভাবে খুলে দেখি, হাঁ, সত্যি কে একটি নারী আমার পাশে বসে—অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পেলুম না। তার রাঙা শাড়ীটা ভোরের আকাশে অরুণবর্ণোচ্ছ্বাসের মত। গাড়ীর একেবারে কোণে সরে গেলুম, সে আরও আমার কাছে সরে এল, তার আঁচলটা আমার গায়ে এসে পড়ল, তার আঁচলের স্পর্শ পেয়েই বুঝতে পারলুম সে কে। সে মায়া!

হাঁ, সে মায়া। সে কোথা থেকে কেমন করে এল, সে সত্যিই কি মায়া, এ সব ভাববার, ভয় পাবার মত মন আমার তখন ছিল না। আমার মোটেই ভয় করল না, বেশ ভাল লাগতে লাগল। মনে হল, বিয়ে বাড়ীর সুন্দরী যুবতী নিমন্ত্রিতাদের যে টুকরো হাসি, ছড়ান লাবণ্য, সাজ-সজ্জার দীপ্তি দেখেছি, সব যেন এক অপরূপ নারীতে মূর্ত্তিমতী হয়ে আমার পাশে এসে বসল। সে মূর্ত্তি মায়ার রূপ নিয়ে এল। তাকে নিয়ে কত বিয়ে বৌভাতের নিমন্ত্রণ খেয়ে এম্নি তারাভরা রাতের অন্ধকারে

দুজনে পাশাপাশি বসে বাড়ী ফিরেছি, তার গায়ে মাথাটা রেখে গাড়ীর দোলায় ঝিমোতে ঝিমোতে সারাপথ এসেছি, সেই সব হারাণ রাত্রিগুলির স্পর্শ-স্মৃতিতে মনটা একটু উদাস ছিল, সে পাশে এসে বসতেই দেহ-মন তারি স্পর্শ-সুধায় সিঞ্চিত হয়ে গেল।

মাথায় ধীরে হাত বুলিয়ে সে বল্লে, তোমায় ভারি রোগা দেখাচ্ছে। মেয়েরা এই বাঁধা বুলিটা দিয়েই কথাবার্ত্তা সুরু করে। কিন্তু কথাগুলি শুনতে বেশ ভাল লাগল। যতক্ষণ সে চুপ করে বসেছিল কোন ভয় করে নি, কিন্তু সে কথা আরম্ভ করতেই গা একটু সিরসির করে উঠল, তবু বেশ আরাম বোধ হল। কতদিন তার গলার মিষ্টি সুর শুনি নি, তার হাতের আদরের স্পর্শ পাই নি।

ধীরে সে আবার বল্লে, তোমায় বড় রোগা দেখাচ্ছে।

তা হবে, কিন্তু তুমি এত দেরী করে এলে কেন? বিয়ে-বাড়ীতে আসবার সময় আসলে পারতে, ফিরে যাবার সময় এলে কেন?

কেন, আমি ত সারা সন্ধ্যে তোমার সঙ্গে ছিলুম।

আমি সারা সন্ধ্যে রাত্তির তোমায় এত খুঁজেছি।

তাই নাকি!

হাঁ, জান, সন্ধ্যেবেলায় যখন বিয়ে বাড়ীতে আসবার জন্যে জামা কাপড় পরছিলুম, হঠাৎ মনে হল আয়নায় তোমার মুখখানা চমকে ভেসে উঠেছে, হেসে মুখ ফেরালুম, তুমি ত পাশে নাই, সাজ-সজ্জাটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল, তুমি থাকলে

তোমাকে কত তাড়া দিতে হত, তোমার ঘরের বন্ধ দরজাটা একবার খুললুম, মনে হল, খুলেই দেখতে পাব, তুমি সাজছ, আমায় বকে উঠবে, হায়, তোমার শূন্য ঘরটা করুণ নয়নে চেয়ে রইল।

ও!

তারপর, জান নেমন্তন্ন বাড়ীর দরজায় একা ট্যাক্সি থেকে নামলুম, ঠিক আমার পরেই যতীন তার স্ত্রীকে নিয়ে মোটর হাকিয়ে এল, কি রকম ষ্টাইল করে নামল, কিন্তু তুমি যদি আমার পাশে থাকতে, তুমি ওর স্ত্রীর চেয়ে অনেক কায়দা করে নামতে পারতে।

সত্যি!

তারপর জান, বিয়ে বাড়ীতে কত সময় যে মনে হয়েছে, তুমি যদি কাছে থাকতে!

কেন?

এক ঘরে দেখলুম, সতীশ আর তার স্ত্রী এক কোণে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফাস্ গল্প করে কি হাসাহাসি করছে, এমন রাগ হল, কি জানি, মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল, তোমার সঙ্গে কতদিন গল্প করি নি। আর জান, দত্তদের বাড়ীর সেই দাঁত উঁচু-করা মেয়েটা মাদ্রাজী শাড়ী পরে এসেছিল, তোমায় যে রকম কিনে দিয়েছিলুম, এমন বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল, তুমি যদি সেই শাড়ীখানা আজ পরে আসতে, সবাই বুঝতে পারত, কাকে কি পরালে কেমন মানায়।

আমাকে যে খুব সাজাতে পার, সেই গর্ব্বেই গেলে।

নিশ্চয়! ওরা কি বোঝে? জান মিসেস রায় আজ কি সেজেই কি গর্ব্বেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, যেন তিনি সব চেয়ে সুন্দরী, তুমি যদি সেই কাশ্মীরি ব্লাউজটা আর পার্শী শাড়ীটা পরে আসতে তবে তাঁর রূপের দেমাক কিছু কমত।

এই জন্যে আমায় মনে পড়ছিল?

তা নয়, জান, যখন খাওয়া শেষ হল, সব গল্প শেষ হল, সবাই যখন যে যার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে গাড়ীতে চড়ে বাড়ী চল্ল, আর আমি একা একটা গাড়ীতে উঠলুম, মনটা ভারি হয়ে এল।

আমারও মনটা ভারি খারাপ লাগছে, ওগো!

হাঁ, বলত, ওই কথাটা আবার বলত, কতদিন যে তোমার ডাক শুনি নি—

কি? ওগো?

হাঁ, কি মিষ্টি তোমার কথা!

ওগো!

তার কালো চোখ থেকে এক ফোঁটা জল ঝরে আমার হাতের ওপর এসে পড়ল। তার হাতখানি ধরতে ধীরে হাত বাড়ালুম। একি, সে এত রোগা হয়ে গেছে, কি সরু তার হাতখানা, চুড়িগুলো বড় হয়ে ঝুলে পড়েছে, কৈ তার সুডোল কোমল সুন্দর হাতখানি! একি শুধু হাড়, মাংস নেই? চমকে উঠে ভাল করে চাইলুম, হায়, কোথায় সেই বসন্তের অপরূপ পুষ্পবল্লরীর মত সুন্দরী যুবতী, এ যে একটা কঙ্কাল আমার পাশে বসে, আমি তাকে যে অলঙ্কার দিয়েছি, সেগুলো তার হাড়ে

হাড়ে গাঁটে গাঁটে জ্বলজ্বল করছে—তার মাথার সোনার সিঁথি, তার গলায় মুক্তায় হার, তার কানে মণির দুল, তার হাতে সোনার বালা, তার আঙুলে হীরার আংটি—আমি তাকে যে অলঙ্কার দিয়েছি সেগুলো তৃষিত ক্ষুব্ধ চোখের মত জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। কিন্তু আমি তাকে যে হৃদয় দিয়েছি, যে হৃদয়ের প্রেম তার ঠোঁটের স্পর্শে, হাসির আলোয়, তার কোমল অধরের লাল আভায় জ্বলত, তার সুন্দর বুকের কাঁপনে দুলত, তার কোমল মধুর হাতের ছোঁয়ায় জুড়িয়ে দিত, সে প্রেম কোথা গেল? হায়, সে প্রেম মরে গেছে? তাই বুঝি সে এই হীরামুক্তা বসান সোনার অলঙ্কার-ভরা কঙ্কালের রূপ নিয়ে এল! হয়ত সেও মরে গেছে। কতদিন তার কোন খোঁজ নিই নি—

বাবু, কোন্ বাড়ী? গাড়োয়ানের ডাকে চমকে জেগে উঠলুম। দেখি, গাড়ীটা আমাদের অন্ধকার গলির সামনে দাঁড়িয়েছে, আমার জলে-ভেজা চোখে সব ছলছল করছে। গাড়োয়ানটা গাড়ী গলির ভেতর ঢুকিয়েছে দেখে রেগে উঠলুম—ও কাঁহা লে যাতা!

বাবু এই গলিই ত বলেছিলেন।

নেহি উধার চালাও।

শ্বশুরবাড়ীর রাস্তার দিকে জোরে হাঁকাতে বল্লুম। গাড়োয়ানটা ভাবল, হয়ত মাতাল হয়েছি। সত্যই তখন বেদনায় মত্ত হয়ে উঠেছিলুম, হয়ত মায়া নেই,—এই কথা ভেবে পাগল হয়ে উঠেছিলুম। তারপর শ্বশুরবাড়ীতে রাত সাড়ে বারোটার সময় গিয়ে কি কাণ্ড করেছিলুম, তার বিস্তারিত বিবরণ ত শুনেছ!

হেসে বল্লুম, হাঁ, তা একটু অতিরঞ্জিতভাবেই শুনেছি তারপর তোমার সত্য বর্ণনাটা ভাল লাগবে না।

চা'টা খাও, জুড়িয়ে গেল।

সন ১৩৩৪।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু লিখিত

উপন্যাস

রমলা (তৃতীয় সংস্করণ)	১৸০

ছোটগল্প

মায়াপুরী	১॥০
রক্তকমল	১॥/০
কল্পলতা	১।০

ছোট ছেলেদের বই

অজয়কুমার	১৲
সোনার কাঠি	৸০